KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন. (SAMAKALIN)	Size : 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number : ৪/- ৪/- ৪/- ৪/-	Year of Publication : কার্তিক, ১৩৬৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩ পৌষ, ১৩৬৩ ফাল্গুন, ১৩৬৩
	Condition : Brittle / Good
Editor : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

Regd No. C3697 Phone : 23-5155 -/8/- SAMAKAL

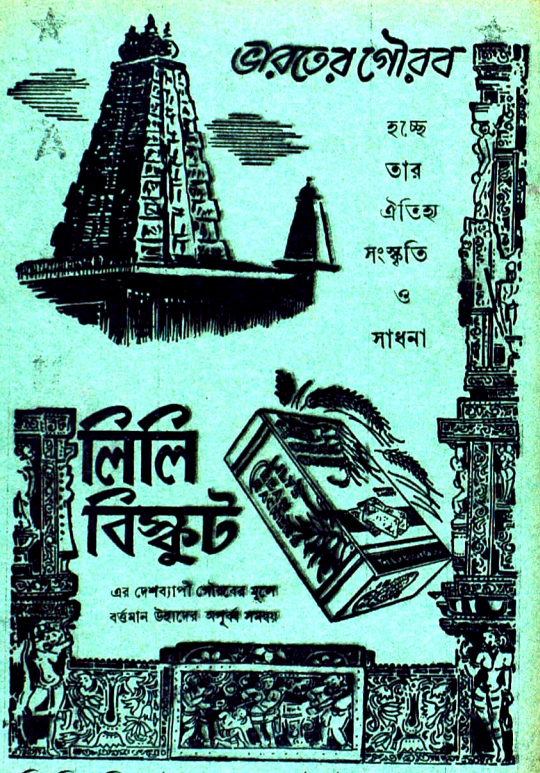

সমকালীন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সম্পাদক
সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

চতুর্থ বর্ষ পৌষ ১৩৬৩

চুলে নূতন জীবন দেয়

বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের নির্য্যাস থেকে প্রস্তুত মনোরম গন্ধযুক্ত অনন্য সাধারণ কেশতৈল কেয়ো-কার্পিন চুলের গোড়ার পুষ্টিসাধন ও চুলের স্বাভাবিক রংএর পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় 'কেরাটামাইন' জাতীয় পদার্থ সরবরাহ করিয়া অচিরেই চুল পড়া ও অকাল পক্কতা বন্ধ করে এবং ঘন নূতন চুল উৎপাদন করে।

কেয়ো-কার্পিন

সক্রিয় ভেষজ কেশতৈল

প্রস্তুতকারক: দে'জ মেডিকেল ষ্টোরস প্রাইভেট লিঃ
কেয়ো-কার্পিন বিভাগ
কলিকাতা-১৯ ● বোম্বাই ● দিল্লী ● মাদ্রাজ

IPB

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সমকালীন

॥ সূচীপত্র ॥

চতুর্থ বর্ষ পৌষ ১৩৬৩

প্রবন্ধ

সঙ্গীত ও সমাজ চেতনা : স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ৫১৩
বাংলে নৃত্য প্রসঙ্গে : দীপ্তি ত্রিপাঠী ৫৩১

কবিতা

কিছু হ'ল যদি : কুমুদ ভট্টাচার্য ৫১৬
বৃষ্টির শব্দ : দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫১৭
স্ফুলিঙ্গ : সুধীর সেন ৫১৮
চৈত্রের শান্তিনিকেতনে : কমলেশ চক্রবর্তী ৫১৯

গল্প

গুল্লি : বাণী চট্টোপাধ্যায় ৫২০

উপন্যাস

এক ছিল কন্যা : স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৩৭
পুরশ্চরণ : মদন বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৭৪

আলোচনা

বঙ্গসাহিত্য প্রসঙ্গে : অমল ঘোষ ৫৪৯

সমাজসমস্যা

করণিক প্রসঙ্গে : অচিন্ত্যেশ ঘোষ ৫৫২

গ্রন্থপরিচয়

বাংলার সাহিত্য (নারায়ণ চৌধুরী) : রথীন্দ্রনাথ রায় ৫৫৫

সংস্কৃতিপ্রসঙ্গ

চিত্র প্রদর্শনী : নিখিল বিশ্বাস ৫৫৮

নিখুঁত মূর্তি গড়তে হলে

ভালো ভাস্করের খোঁজ পড়ে। তেমনি, কোনো কারণে স্বাস্থ্য যদি ভেঙে পড়ে, চিকিৎসার জন্য ভালো ডাক্তারের শরণাপন্ন হোন। আজকাল ভগ্নস্বাস্থ্যের একটি প্রধান কারণ দৈনিক জীবনসংগ্রামে যে পরিমাণ শক্তি ক্ষয় হয়, সেই অনুপাতে সঞ্চয়ের ভাগ কম। উত্তম আহার্যও এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়, কারণ শক্তিক্ষয়ের চেয়ে শক্তিসঞ্চয়ে সময় লাগে অনেক বেশি। এরই ফলে জীবন অবসাদক্লিষ্ট, দেহ নানা রোগের আধার হয়ে ওঠে। এমন অবস্থায় চিকিৎসক অনেক সময় একটি সারবান তেজোবর্ধক টনিক গ্রহণের উপদেশ দিয়ে থাকেন। ভিনকোলার কথা তাঁকে জিগগেস করে দেখবেন। সাধারণ ও ভিটামিন সমৃদ্ধ— এই দুই প্রকার ভিনকোলা পাওয়া যায়।

ভিনকোলা

সারবান তেজোবর্ধক টনিক

স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ কলকাতা-১৪

PBV I

সমকালীন
চতুর্থ বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩

সঙ্গীত ও সমাজ-চেতনা

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সমাজের মানুষকে বাদ দিয়ে সঙ্গীতের সৃষ্টি, সঙ্গীতের বিকাশ, সঙ্গীতের অনুশীলন বা আলোচনা কোন কিছুই হ'তে পারে না। সঙ্গীতের জন্ম কবে থেকে ও কেমন ক'রে হ'ল, কণ্ঠসঙ্গীতের —না বাদ্যযন্ত্রের সৃষ্টি আগে; কথা ও নৃত্য সঙ্গীতের তথা সুরের চিরসহচর ছিল কিনা—এ সকল প্রশ্ন ও প্রশ্নের সমাধান করার চেষ্টা করে সমাজের জ্ঞানলিপ্সু ও চিন্তাশীল মানুষ।

মানুষের প্রতিভার উন্মেষ যেদিন থেকে হ'ল সেদিন থেকেই বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে তার হয়েছে পরিচয় এবং তারই বিকাশ ও সৌন্দর্যকে সে পর্যবেক্ষণ করেছে, তন্ন তন্ন ক'রে বোঝার চেষ্টা করেছে তার মনের বিশ্লেষণীশক্তি দিয়ে প্রকৃতির মর্মকথা। অজানাকে সে ক্রমে জানার চেষ্টা করল বুদ্ধি দিয়ে, আবার তারই অনুকরণ ক'রে প্রতিকৃতির প্রতিফলন করল ভাষায়, সুরে, রেখায় ও আকার-ইঙ্গিতে। ইন্দ্রিয়ের অনাস্বাদিত যা-কিছু ছিল, তাকে প্রকাশ করতে যত্নবান হ'ল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে। অবাস্তবকে বাস্তব অনুভূতির সীমানায় এনে তারই উপভোগে—তারই আনন্দে হ'ল ভরপুর। এমনি ক'রে সৃষ্টি হ'ল সৌন্দর্যের স্পর্শ নিয়ে ললিতকলার। পার্থিব সুরে, তুলিকার রেখায় ও তক্ষণযন্ত্রের আঘাতে সঙ্গীত, চিত্র ও ভাস্কর্যের হ'ল জন্ম; আনন্দানুভূতির পথ হ'ল মানুষের কাছে উৎসারিত—উন্মুক্ত!

কিন্তু এ'সকল-কিছুর পেছনে লক্ষ্য করা যায় সমাজবাদী মানুষের প্রাণপাত পরিশ্রম, ঐকান্তিকী নিষ্ঠা ও সাধনা। কলা-সৌন্দর্যের ক্রমবিকাশের পথে সৃষ্টি হ'ল তার ইতিহাস, বিজ্ঞান ও ব্যাকরণ আর বৌদ্ধিক পরিপ্রেক্ষণের মাধ্যমে সৃষ্টি হ'ল তার দর্শন ও মনোবিজ্ঞান। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সুরের সঙ্গে ভাবের নিয়ন্ত্রণে এল সাহিত্যের উপযোগিতা। কথা ও সুরের নিয়ন্ত্রণে সৃষ্টি হ'ল তালের। তালের সমতা রক্ষায় এল লয় ও ছন্দ। লালিত্য-পরিবেশনে সৃষ্টি হ'ল ক্রমে অলংকার ও মূর্ছনা। নিরাভরণ সঙ্গীতের সার্থকতায় ধীরে ধীরে এল আভরণ। এল রস ও রসানুগত ভাব। মোটকথা মানুষের প্রয়োজনেই দেখা দিল সমাজে সালঙ্কৃত সঙ্গীতের রূপায়ণ। বিচিত্র রুচির অনুপাতে সঙ্গীতে সৃষ্টি হ'ল আবার রূপের বিচিত্রতা। নামে, রূপে বা গঠনে ও বিকাশেও এল কত কিছু বিবর্তন। খৃষ্টপূর্ব ভারতীয় সমাজে প্রকাশ পেল সামগান। সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র বীণা ও

বেণুর এল উপযোগিতা। বৈদিক ও ক্ল্যাসিক্যাল যুগের সন্ধিক্ষণে দেখা দিল গান্ধর্বগান শংকরস্তুতি ব্রহ্মগীতিকে নিয়ে। শুদ্ধ সাতটি জাতিগান তথা জাতিরাগ-গানের হ'ল প্রচলন। শিব বন্দনায় মুখরিত সাহিত্যের সম্মান তখনও থাকল অব্যাহত।

রামায়ণের যুগে (খৃষ্টপূর্ব ৪০০) শুদ্ধ সপ্ত জাতিগানের ঝঙ্কার শুনি আমরা লব-কুশের মুখে। রামায়ণ তথা রামচরিত বিকাশ লাভ করল তখন সাহিত্যের স্থান অধিকার ক'রে। নারদীশিক্ষার যুগে (খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী) কেন, মহাভারতের (খৃষ্টপূর্ব ৩০০—২০০) সমাজেই দেখি গ্রামরাগের বিকাশ। খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী) ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে স্বীকার করেছেন—জাতিরাগ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে গ্রামরাগ। ভরত রামায়ণের শুদ্ধ সাতটি জাতিরাগের পরস্পর-সম্মিলনে সৃষ্টি করলেন আরো এগারটি জাতিরাগ। ভরতের সময়ে জাতির সংখ্যা দাঁড়াল আঠারটিতে। গ্রামরাগের প্রচলনও ছিল জাতিরাগের পাশাপাশি। অভিনয় মঞ্চের প্রয়োজনেই বেশীর ভাগ তাদের ছিল অনুশীলন। মতঙ্গের সময়ে (খৃষ্টীয় ৫ম—৭ম) এল শুদ্ধিকরণের পালা। পতিত ও অভিজাতকে নিয়ে তিনি করলেন অসংখ্য দেশীরাগের সৃষ্টি। ব্রাহ্মণ্যবাদের গোড়ায় কুঠারাঘাত করেছিলেন ভরতই নিজে। তিনি সর্ববর্ণের জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন সঙ্গীত। অবশ্য গান্ধর্বগানের প্রচলন ছিল অন্ততঃ তাঁর সময় পর্যন্ত। মতঙ্গ জাতীয় ও দেশীয় বা আঞ্চলিক সুরগুলির ব্রাত্যত্ব বিলুপ্ত ক'রে তাদের অভিজাত রাগপর্যায়ভুক্ত করেছিলেন নির্বিচার মন নিয়ে। ভারতীয় সঙ্গীতের ভাণ্ডার তখন হয়েছিল সমৃদ্ধ। খৃষ্টীয় তেরশো থেকে আঠারশো শতাব্দী পর্যন্ত কত নিত্য নূতন রাগের হয়েছিল সৃষ্টি। 'রাগ' শব্দের অভিধানে রাগ পেয়েছিল তখন কৌলিন্য আর সঙ্গীতের ইতিহাসই তার সাক্ষী।

সঙ্গীতের ইতিহাসের প্রসঙ্গে একটি কথা এখানে আলোচনা করলে বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, আজকাল অনেকেই বলেন ও লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করেন ভারতীয়সঙ্গীতের প্রমাণ-যোগ্য কোন ইতিহাস নাকি রচনা হওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্য একনিষ্ঠ অনুসন্ধান তথা পরিশ্রমের অভাব থাকলে সঙ্গীতের ইতিহাস কেন, কোন বিষয়েরই ইতিহাস রচনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু আসলে নথিপত্র ঘেঁটে সত্যিকারের চেষ্টাই বা করেছে ক'জন। লুপ্ত ও অবহেলিত সংস্কৃত ভাষায় লেখা সঙ্গীত-গ্রন্থগুলির অনুশীলনেই বা আমাদের মনোনিবেশ কৈ? বরং শ্রম-বিমুখতাকে প্রশ্রয় দিয়ে সঙ্গীতের আলোচনার প্রসঙ্গে দোহাই দিই আমরা সাধনার। কিন্তু একথা তো সত্য যে, ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতার যদি একটা মোটামুটি ইতিহাস রচিত হয়ে থাকে তবে তাদের অবিচ্ছেদ্য উপাদান হিসাবে ললিতকলা সঙ্গীতের ইতিহাসই বা রচনা করা সম্ভব হবে না কেন? সমাজ, শিল্প, শিক্ষা, যুদ্ধবিগ্রহ, ব্যবসা-বাণিজ্য, সাহিত্য, ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্র এ সবেরই একটা মোটামুটি ইতিবিবরণের সন্ধান থেকে আমরা বঞ্চিত নই। অথচ যত-কিছু বঞ্চনার কাহিনী শুনি সঙ্গীতের ইতিহাসের বেলায়। পরিশ্রমবিলাসী জ্ঞানলিপ্সু মানুষের অভিনিবেশ ও চেষ্টা থাকলে মনে হয় অসাধ্যসাধনও হতে পারে সঙ্গীতের ইতিহাসের বেলায় এই আমার বিশ্বাস।

এখন সঙ্গীতে সমাজ-চেতনার সম্বন্ধেই দু'এক কথা এখানে আলোচনা করব। মানুষ

সমাজবাসী কেন—সমাজবিলাসী জীব তা আগেই বলেছি। তার প্রাত্যহিক জীবনে অজস্র কর্ম-সংগ্রামের মধ্যে সে চায় বিশ্রাম, শান্তি ও আনন্দ, কেননা বিশ্রাম, শান্তি ও আনন্দই তার কর্মময় জীবনকে করে সবল ও নিত্য-নূতনভাবে সচল। বিশ্রাম ও শান্তির মধ্যে আবার আনন্দের অনুভূতিই বড়। কিন্তু সত্যিকার আনন্দানুভূতিই বা সে পাবে কোথা থেকে। আদিম সমাজ-জীবনে এই আনন্দের অনুসন্ধানেই নাকি সঙ্গীতের হয়েছিল সৃষ্টি। দুঃখ মেশানো জীবনের অভিজ্ঞতাকে সে কথা ও সুরের মাধ্যমে প্রকাশ ক'রে পেত শান্তি ও সান্ত্বনা। সুরই কথাকে করত অবশ্য প্রাণস্পর্শী ও সুললিত। ভাবের পুলক গানের মধ্যে সৃষ্টি করল ছন্দের চেতনা ও ছন্দের সঙ্গে মিতালী পাঠাবার জন্য জন্ম হ'ল বাদ্য ও নৃত্যের। গণজীবনকে প্রাণবান ও সবল করার জন্যই নির্বাচিত হ'ল সঙ্গীতের উপযোগিতা। মানুষও তা বুঝল ও তার পরি-বর্ধণে ও পরিপোষণে করল আত্মনিয়োগ। প্রতিটি যুগেই সঙ্গীত-সমৃদ্ধির জন্য হয়েছে সমাজ-চেতনার জাগরণ, পুরাতনের বুকে নূতনের হয়েছে সংগঠন। সঙ্গীত-সাহিত্য এই বিকাশ ও গঠনের জয়গাথা গানেই মুখর সর্বদা, অতীত ও বর্ত্তমানের মিলনসাধনেই সে সচেষ্ট।

মোটকথা সমাজ-চেতনাই পার্থিব সকল সম্পদকে করে সার্থক ও সমৃদ্ধ। সঙ্গীতের বেলায়ও তাই। শিক্ষা, সমাজ ও আদর্শকে মানুষের জীবনে ফুটিয়ে তোলার জন্য সঙ্গীতের থাকা উচিত উপযোগিতা ও সমাজ-চেতনা এদিক থেকে তাকে করবে প্রেরণা-দীপ্ত। শ্রেষ্ঠবিদ্যা সঙ্গীতের সার্থকতা তবেই থাকবে পুরোপুরিভাবে। ক্ষণিক উপভোগ ও দৌখীন অনুশীলনে সঙ্গীতের স্বচ্ছলতা ও পূর্ণমুক্তির পথ হবে না উন্মুক্ত। মহিমময় শিক্ষার ভিত্তিতে সঙ্গীতের প্রাসাদ হবে রচিত। কেননা শিক্ষা বা বিদ্যার প্রকৃতিই হ'ল মালিন্য দূর ক'রে আলোকপাত করা। অশিক্ষার অন্ধকার নষ্ট করার জন্যই তো শিক্ষার প্রয়োজন। সঙ্গীতের প্রয়োজনও তাই। সমাজ-চেতনার জাগরণ ঠিক এদিক থেকেই হওয়া উচিত। মানুষের সনিষ্ঠ চাহিদাই সাংসারিক সকল জিনিসের মধ্যে আনে পরিবর্তন। সমাজ-চেতনাই আনে সংস্কার প্রচলিত ধারার বা গতানুগতিকতার পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে। ঐতিহ্যবাহী সঙ্গীতের অনুশীলন ভারতের সকল দেশেই আজ পেয়েছে সমাদর, আর সে সমাদর মানুষই দিয়েছে তার সুষ্ঠুরূপ ও বিকাশকে চেয়েছে ব'লে। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের আদর্শকেও আমাদের চাওয়ার ও পাওয়ার বস্তু বলে গ্রহণ করতে হবে। সকল জিনিসকে জানা ও বোঝার আকুল আকাঙ্ক্ষাই চেতনা-দীপ্তির পরিণতি। সমাজ মন যেদিনই চাইবে সঙ্গীতের মর্মকথাকে জানতে, সমাজ-চেতনা যেদিনই উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠবে সঙ্গীতের চরম-আদর্শকে উপলব্ধি করার জন্য, সঙ্গীতের স্বাস্থ্যবান রূপ সেদিই হবে পরিস্ফুট, সার্থক ও পরিপূর্ণ হবে সঙ্গীতের জন্ম ও সাধনা। সঙ্গীতের পূর্ণপ্রকাশের জন্য সমাজ-চেতনা তাই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

কিছু হ'ল যদি

কুমুদ ভট্টাচার্য

কিছুই না-হ'তে পারত তো!
এই ফাঁকা শূন্যময় সীমাশূন্যতার
বৃত্তের ভঙ্গিমা-মাখা
ঊর্দ্ধ অধঃ বাম আর দক্ষিণ-বিস্তার,

আর তার বুকে এই অগ্নিপিণ্ড প্রজ্বলন্ত স্থির,

অথবা গভীর
শূন্যের জ্যোতিষ্ক আরো যারা
সর্বাঙ্গে আলোর আলা লুব্ধতায় উন্মুখ অধীর,

কিম্বা এই ভিত্তিমাত্র মৃত্তিকা-নিভর
পৃথিবীর ঘর
আবরণ-আভরণ ছাড়া,
ফেরে দিশাহারা
আজো যে নিয়ত—

এই যারা হ'ল
এরাই না-হ'তে পারত তো!
কিছুই না-হ'ত যদি তাহ'লে কী হ'ত?

কিছুই না-হ'ত যদি! এ মিছেজল্পনা!
কিছুই না-হ'ত যদি, কিছুই হ'ত-না!

কিন্তু কিছু হ'ল যদি কিছু তার মানেও তো হবে!
সেই মানে কে ক'বে কে কবে?

কেউ কোনো দিল না উত্তর।
অনির্দেশ লক্ষ্যে তাই লক্ষ ভাবে নিক্ষেপিয়া ফিরি
সন্ধানের শর!

বৃষ্টির শব্দ

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

এখনও বৃষ্টির শব্দ। বৃষ্টি থেমে গেলে
আমি জানি সন্ধ্যারাতে সমস্ত হাতের কাজ ফেলে
সে দাঁড়াবে জানলায় উদাস।
বাংলার কুটীরে আজও ফুল্লরার ম্লান বারোমাস
অনুধ্যান প্রতীক্ষায় সমর্পিত হৃদি।
আর যা প্রকট দৃশ্য সকলই তা উত্তাল বারিধি,
পুরিয়ার বিষণ্ণ আলাপে
অহরহ কাঁপে॥

নিবিড় নির্জনে শুয়ে সুরের অজস্র তারা গোণা।
অনিবার একমাত্র স্বপ্নের মূর্ছনা
পুরস্কার পাই হাতে হাতে।
জ্যোৎস্নার রজতদ্যুতি রাত্রির খোঁপাতে
তাও তো স্বপ্নেরই প্রতিভাস।
সে এখনও ধ্যানে স্থির, দয়িতের নিশ্চিন্ত নিবাস
অন্যদিকে ঘুমে অকাতর।

তুমি যে বাংলারই কন্যা তাই বুঝি সন্তাপে পাথর
না হ'য়ে এখনও
সলাজ মাটির বুকে মুখর বৃষ্টির শব্দ শোনো!

স্ফুলিঙ্গ

সুধীর সেন

শরীরের ছাই ফেলে, তুমি আমি—বহুত্র সবাই,
হাওয়ায় স্ফুলিঙ্গ খুঁজি। নরম ঘুমের ঘ্রাণময়
সময়ের গলিপথে অথচ আশ্চর্য পরিচয়
কান্নার শিশিরে ঝরে। জলে জলে নিভে রোশ্‌নাই

কথার কাজের মোমে। তবু রোজ কী-যে জল্‌জলে
অনির্বাণ আলা নিয়ে পথ হাঁটি : বিচ্ছিন্ন তারার
ফেরারী ফৌজের মতো। অজগর নামে অন্ধকার,
মেঘের ফণাটি তুলে লক্‌লকে অগ্নির ছোবলে

বিবাক্ত আকাশ গিলে। আমরা তবুও নিরুত্তর,
নিরুত্তাপ। বেঁধে থাকি আত্মরতি রাতের কুয়াশা।
একেক নির্জন দ্বীপ। এই আছি। স্বপ্নের প্রত্যাশা
ঘুমের পাথর-চাপা। কোনোদিন চেতনার স্বর

প্রাণের সিঁড়িটি বেয়ে নামে যদি শরীরের থেকে
মনের খনির তলে—আরো গূঢ় সমুদ্রে সত্তার,
কাল-কালিন্দীর দহে—মৃত্যুর সুরঙ্গ হয়ে পার
হঠাৎ উত্তাপ পায় শরীরেই। নিয়ে যাবে ডেকে

জীবনের ঐকতান। তাঁবু পড়ে ফেরারী ফৌজের।
হাজারো স্ফুলিঙ্গ মিলে খুঁজে পাবে সূর্যের উদ্দেশ।
তখন উৎকর্ণ দ্বীপ : পদক্ষেপ মেলে মহাদেশ।
আগ্নেয় স্বাক্ষর বুকে : শুনি গান রক্তে সমুদ্রের ॥

চৈত্রের শান্তিনিকেতনে

কমলেশ চক্রবর্তী

জানালাটা খুলে দিই—কেঁপে কেঁপে রাত্রির নূপুর
রিন্ ঠিন্ মেঠো সুরে বেজে চলে শুধু ;
ভুলে যাই ক্লান্তির অবসর, ধু-ধু—
এখানে সমস্ত দিন—সমস্ত দুপুর।

দূরে সেই মায়াময় অশোক ও পলাশ
কেন যে আমাকে ডাকে
ঝিকিমিকি দুপুরের ফাঁকে,
হেসে বলে : 'কা'কে চাস, তুই কা'কে চাস ?'
জানিনা তো কা'কে চাই আমি,
তা'কে ডাকি। দুপুরের নির্জনে। শুধু
এই শান্তিনিকেতনে।

অশোক, পলাশ হেসে বলে : 'যদি ভুলে গেলি নাম-ই
স্মৃতি তার তবে কতটুকু মনে আছে ?
সে ছিলো কি কেউ ?
সমুদ্রের ঢেউ
রহে না যে কোনদিন কাছে !'

কা'কে আমি চাই জানে নাতো মুখ দু'টি গাছ
ভাবে তারা আমি বুঝি অভিমানে
এসেছি চৈত্রের শান্তিনিকেতনে,
আমাকে ভালবেসে তাই কাঁদে এই গাছের সমাজ।

গুঙ্গি

বাণী চট্টোপাধ্যায়

সকাল বেলাতেই ছোট পাড়াটায় কুরুক্ষেত্র বাঁধার জোগাড়। কিন্তু অল্পেই থেমে গেল। কান্দুরী ছাগলটার দড়ি ধরে নিয়ে যাচ্ছিল বাঁধতে, ঠাণ্ডামণি মাঠ থেকে গরু বাঁধতে বাঁধতে ডেকে চলেছে, গুঙ্গি—ও গুঙ্গি শুনেছিস? কান্দুরী দাঁত খিচিয়ে জবাব দিল—আমার নাম নাই? নাম ধ'রে ডাকতে মুখে পোকা পড়ে? একটা রহস্যের সন্ধান দিতে চেয়েছিল ঠাণ্ডামণি, হাসি মুখটা নিমেষে কঠিন হয়ে আসে। পোড়া কপাল! আমার মুখে পোকা পড়বে কেন? যারা বিনা দোষে মানুষের মুখে পোকা ফেলায় তাদেরই মুখে পোকা পড়ুক। জিভ্ খ'সে পড়ুক। আমি কি করেছি, শুধু ডাক দিয়েছি তাতেই এত?

নিশোবালা পুকুর ঘাটে বাসনের বোঝা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেও তাজ্জব ব'নে গেল। ও মা গুঙ্গিকে গুঙ্গি বলা হবে না এ কেমন কথা! ওর নামও ত আমরা কেউ জানিনা। ঠাণ্ডামণি চেঁচিয়ে উঠলো, শোন শোন কথা! কেবল ছবার ডাক দিয়েছি, সকাল বেলা আমার মুখে পোকা ফেলে ছাড়লে? ওর মুখে কুরিকুষ্ঠি হবে না! পাড়ার আরও দুচার জন ঘাটের পাড়ে যারা ছিল, তারাও গালে হাত দিল—হায় মা যাব কোথায়! গুঙ্গিকে আজ নাম ধ'রে ডাকতে হবে? ওর আবার নাম আছে নাকি? কান্দুরী তার বিপক্ষদল ভারী দেখে আর কোন উচ্চবাচ্য না করে বাড়ী চললো।

কান্দুরীর নাম সত্যি এখানে নেই, অন্ততঃ কেউ জানে না। জানার দরকার বোধ করে নি কেউ। এগাঁয়ে পা দেবার পর থেকেই তার নাম গুঙ্গি। গোঙ্গার বৌ গুঙ্গি। আজ বার বছর ধ'রে এই নামেই চলে আসছে। আজ হঠাৎ তার মাথা গরমের কারণ খুঁজে পায় না ওরা। কান্দুরী নিজের বাড়ীতে যেয়ে কাঠ হয়ে বসে রইল বারান্দায়। শাশুড়ী সরোমণি বাসনের বোঝা ঘাট থেকে মেজে এনে বললে—ঘরটাতে নুরা দাও বৌ।

—মুই পারিম্ না। একটা মুখ ঝামটা দিল কান্দুরী। সরোমণি তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো ভাল করে। পাড়ার ওদিকে একটা চেঁচামেচি শুনেছিল সে ঘাট থেকে। একটু নরম গলায় বললে—কে কি বলেছে বলত!

কান্দুরী জবাব দিল না কিছু, শুধু আঁচলটা তুলে চোখ ঢাকলো। সরোমণি সরে গেল সেখান থেকে, বউকে কোন দিন কিছু বলে না সে। বলতে সাহস পায় না, গোঙ্গা ছেলের বউ! বেশ তোয়াজ ক'রেই চলতে হয়। 'শত্তুর'দের তো চোখ টন টন ক'রেই আছে। সুযোগ পেলেই ফুস্ মন্তর কানে দেবার চেষ্টা করে। ভাল জাতের বেটী! কেউ কিছু করতে পারে নি। তবু মনে একটা অস্বস্তি নিয়ে গোয়াল ঘরের দিকে গেল সে।

কান্দুরী বসে বোধ হয় নিজের অদৃষ্টের কথাই ভাবছিল। বাইরে থেকে হঠাৎ কানে আসে, আ—পপা—আ—আ—পপা—আ—সাথে সাথে এক পাল ছেলের হুল্লোড়! উঠে যেয়ে

দুয়ারে দাড়ালো সে। পাঁচ থেকে বার বছরের এক দঙ্গল ছেলে একটা চামচিকা দড়িতে বেঁধে সেটা গোঙ্গার গায়ে ফেলে দিচ্ছে সকলে আর গোঙ্গা অব্যক্ত ভাষায় চেঁচিয়ে উঠছে। ছেলেদের মজার অন্ত নেই। গোঙ্গার নিজেরও বেশ মজা লাগছে। চামচিকাটা ঝেড়ে ফেলে দিয়েই আবার নিজেই ওদের সাথে হেসে উঠছে। মনটা রি-রি করে উঠলো কান্দুরীর। হায়রে! এই স্বামী আমার! যেন কুকুর বিড়াল নিয়ে খেলা ক'রছে। একটা জলজ্যান্ত যোয়ান মানুষ, কেউ একটু গ্রাহ্যও করেনা। সত্যি মানুষ হলে ত! হাত পা থাকলেই কি মানুষ হয়? হঠাৎ ছেলেরা সকলে এক সাথে গোঙ্গার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আর চামচিকাটা তার মাথার উপর ফেলে দিল। অসহায় জীবটী গোঙ্গার লম্বা ঝাঁকড়া চুলে আত্মরক্ষার জন্য লেপ্‌টে থাকে। গোঙ্গা দুহাতে ফেলে দিতে যায়, কিন্তু ছেলেরা সকলে দু হাত ধরে ঝুলে পড়েছে। গোঙ্গার অসহায় চীৎকার শুধু আ—ও পপা—। কান্দুরীর আর সহ্য হ'লনা। তাড়াতাড়ি যেয়ে চামচিকাটা একটানে নিয়ে একটা আছাড় মেরে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। আকস্মিক রসভঙ্গে ছেলেরা সব ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়েছে। কান্দুরী ধমক লাগালো—আকাটিয়া চ্যাংড়া সব। লঘু গুরু জ্ঞান নাই। চলে যাও সব চলে যাও! খেলার ছিরি!

গোঙ্গা আ—ও আ—ও ক'রে কি বলছে; কান্দুরী তার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো—তুই মরিস্ না! যম তোকে চোখে দেখে না! ছেলেরা সব সুড় সুড় ক'রে বাড়ীর মুখে চললো। কান্দুরী বাড়ীর মধ্যে এসে চোখে কাপড় দিয়ে কেঁদেই ফেললো। গোঙ্গা পিছে পিছে আসে। ওর সামনে অপরাধীর দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। কান্দুরী কাঁদছে বুঝতে পেরে হাত দুখানা ধ'রে মাপই চায় বোধহয়। কান্দুরী জোরে ঠেলে দিল তাকে। দূর দূর সামনে থেকে দূর হ।

গোঙ্গা দাঁড়িয়ে থাকে চুপ ক'রে। শ্রবণ শক্তি নেই তার তাই ছুঁচ্‌লো দৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকিয়ে ভিতরটা বোঝার চেষ্টা করে। বোঝেও বা। গোঙ্গা সরে না দেখে কান্দুরী উঠে যেয়ে দুয়ারে খিল দিয়ে শুয়ে পড়লো।

সরোমণি আঙ্গিনাতেই দাঁড়িয়েছিল, মুখখানা কঠিন হ'য়ে এলো তার। বউএর এমন ভাব-ভঙ্গী তো সে দেখে নি! পাড়ার কেউ কিছু ব'লেছে নাকি খোঁজ করার জন্য আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।

নিশোবালার আঙ্গিনাতে যেয়ে দাঁড়াতেই নিশোবালা বেরিয়ে এলো।—পিসি—ও পিসি তোমার বউএর নামটা বল। গুঙ্গি ব'লে ডাকা আর চলবে না, কখন বেভুলে গুঙ্গি ডেকে মুখে পোকা ফেলাবো বাপু!

সরোমণি এগিয়ে গেল—কেন কি হ'য়েছে বলত নিশো—

নিশোবালা সকালের ঘটনাটা জানালো। সরোমণি চিন্তিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করে—থালি ডেকেছিল তাতেই?

—হ্যাঁ হ্যাঁ শুধু গুঙ্গি ব'লে ডেকে বলতে গিয়েছিল—

—কি বলতে গিয়েছিল?

—ও মা শোন নাই? শীলা আবার গাঁয়ে ফিরে এসেছে। ভুটকু তাড়িয়ে দিয়েছে ওকে, এসে কি কান্না! তখনি আমরা বলেছিলাম পিসি কুল ছাড়িস না। স্বামীর ভিটায় পড়ে থাক, একটা তোর পেট। তখন তো শুনলো না। ঐ ছোঁড়ার সঙ্গে বেরিয়ে গেল। আরে বাপু উজানভাটীতে মিল হয়? তুই হচ্ছিস বুড়ি আর ও ডগমগ ছোঁড়া। তোকে নিয়ে কদিন ঘর ক'রবে? তা শুনলো না। বুক ফুলিয়ে চ'লে গেল। এবার কেমন হ'য়েছে তো।

—ওমা তাই নাকি? আমরা পাড়াশুদ্ধ সবাই মানা ক'রেছি। ছোঁড়া দেখে ভুলিস না। নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ, কী ফুটানির কথা তখন! আমরা নাকি হিংসাতে মানা ক'রছি। বেশ হয়েছে।

নিশোবালা বললে—বেশ ব'লে বেশ। একেবারে সর্ব্বস্বান্ত। যা এক আধটু চান্দি সোনা ছিল সব বেচে নিকায় খরচ ক'রলো। এখন?

—ঠিক হ'য়েছে! যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

খবরটা বেশ মুখরোচক, এই চিবিয়ে একটা বেলা কাটান চলে, কিন্তু সরোমণির মনটা ভাল নয় তাই ও কথার আর জের টানলো না। বললে সে তো না হয় চ্যাংড়া বুড়ির কথা, কিন্তু আমার বউ হঠাৎ এমনি পাড়ার লোককে গাল দিল কেন? নিশোবালা সরোমণির সম্পর্কে ভাইঝি। ঘরের কথা লেন দেন চলে। আজ সকালে গোঙ্গার সঙ্গে ব্যবহারটাও খুলে বললো। ও ত গোঙ্গাকে কোনদিন এমন করে নাই নিশো। সন্ন্যাসীডাঙ্গা থেকে আসার পর থেকেই যেন কেমন হ'য়ে গিয়েছে। আমাকেও তেমন মা ব'লে ডাকেনা। কোন শত্রু যে পিছে লেগেছে! নিশোবালা শীলার কাছে অনেক কথা শুনে এসেছিল কিন্তু সে সব কিছু না বলে বললে, শত্রুর কি অভাব আছে পিসি? কারও ভাল দেখলেই হাজার শত্রু। বউ তোমার খারাপ ছিল না তবে, 'যদি লাগে দুতী কি ক'রবে সতী'? সরোমণি চম্‌কে উঠলো। কোন কুটনী লেগেছে পেছনে তুই জানিস নিশো?

নিশো কথাটা যেন উড়িয়ে দিতে চায়—না না তোমার কথা শুনেই বলছি। ভাল বউ বিগড়ে যাচ্ছে তাই।

—কুটনী যদি লাগে তবে কি হবে নিশো? কত আশা আমার বউ গোঙ্গাকে দেখবে। আমি নিশ্চিন্ত মনে চোখ বুজবো। বউ যদি পরের নাচনে নাচে আমার গোঙ্গা মরে যাবে নিশো। গলাটা তার ভারী হ'য়ে আসে।

—তুমি অত ভাবছো কেন পিসি? বউ পালালেই হ'লো? দশ সমাজ নাই? ওর বাপ পাঁচশো টাকা পণ গুণে নিয়েছে; যেতে হলে পণের টাকা ফেলে দিয়ে যাবে। ঐ টাকায় তোমার আবার চাঁদের মত বউ আসবে, তুমি অনর্থক ভেবো না। বাড়ী যাও। সরোমণি উঠে বাড়ী চললো। মনটা ভয়ানক খচ্‌খচ্‌ করছে। নিশোর ভরসায় তার মন আশ্বস্ত হ'তে পারে না। এ বউ চলে গেলে আবার যে গোঙ্গার বৌ আসবে মনে তেমন কোন ভরসা পায় না। তবু পাঁচশো টাকা পণের বৌ, এই জোরটাকে অবলম্বন ক'রে আস্তে আস্তে বাড়ী মুখো চললো।

ঠাণ্ডামণির তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর কানে আসে। খনখনে গলায় যার উদ্দেশ্যে যা বলছে তা নিঃসন্দেহে শ্রুতিসুখকর নয়। সরোমণি সে দিকে কানই দিল না।

কান্দুরী বিছানায় শুয়ে কাঁদলো কিছুক্ষণ। এই আমার স্বামী। কালা বোবা। দুটো সুখ দুঃখের কথা বলার উপায় নাই। মুখ বুজে কাঁহাতক রাত কাটান যায়? এতদিন ছোট ছিল, সারাদিন কাজকর্ম্ম ছুটোছুটি ক'রেছে, রাত্রি হলেই যেখানে পেরেছে ঘুমিয়ে প'ড়েছে। এখন তার নব প্রস্ফুটিত যৌবন। কত কথা গুমরে ফেরে মনে। নিঝুম রাতে মনের মানুষ খুঁজে ফেরে মন। কত স্বপ্ন কত কথা শুধু গুঞ্জনে। সন্ন্যাসীডাঙ্গা যাওয়ার পরই তার চোখ ফুটেছে। গুঙ্গি নামটাই কলঙ্কজনক বুঝে এসেছে ভাল ক'রে। ভুটকুর হাসি মুখটা বারে বারে মনে হয়। যে কদিন কাকার বাড়ী ছিল, ভুটকু ওখানেই পড়ে থাকতো।

খুকীদি ঠিকই বলেছে—হাত পা থাকলেই কি মানুষ? গোঙ্গাটাকে নিয়ে জীবন কাটাবি কেমন ক'রে?

জানালার কাছে গোঙ্গা আ—ও আ—ও ক'রে তারই কাছে কি আবেদন জানাচ্ছে। কি চোখের চাহনী। যেন শকুনের দৃষ্টি। বুকের ভিতর পর্য্যন্ত কুঁড়ছে। না, পালাতে হবে। ভুটকুর কত খোসামুদী। খুকীদিকে দিয়ে কুড়িটা টাকাও দিয়েছে। কিন্তু ওর বাড়ীতে শাঁকচুন্নীটা আছে যে! ওর সাথে এক সঙ্গে ঘরকরা, বাব্বাঃ! তাড়িয়ে দিবে বলেছে ভুটকু। তবু এত দিন ঘর ক'রে স্বামীর ঘর ছেড়ে যাবে কেমন ক'রে? দশের মানুষ যে বজ্জাত! মানুষের মনের দিকে দেখে ওরা? ওরা না দেখলে নিজেকেই দেখতে হবে। গাঁয়ের লোক তার সুখ্যাতি করে কিন্তু তাতে তো মন ভরবে না!

বাড়ীর আঙ্গিনায় শাশুড়ীর সাড়া পেয়েই মনটা বেশ নরম ক'রে দুয়ার খুলে বের হ'য়ে এলো কান্দুরী। সকালে গোঙ্গাকে গাল দেওয়ায় একটা অনুশোচনাও এসেছে মনে। শাশুড়ী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে—

—কি পাক হবে মা আজ? কান্দুরী জিজ্ঞাসা করলো।

সরোমণির মনটা নরম হ'য়ে আসে। বললে—চল চল কি আছে দেখি। শাশুড়ী বউএ তরকারী কুটতে বসে।

—শীলার কাণ্ডখানা দেখলে বউ? গাঁয়ের একটা মজার খবর বউকে খুশী করার জন্য বলল সে।

—কি হ'য়েছে শীলার? চম্‌কে উঠলো কান্দুরী।

—ভুটকু বাড়ী থেকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। আরে বাপু ছেলে আর বুড়িতে ঘর সংসার জমে কখনো! দুকুড়ি বছর বয়স তোর, আর ভুটকু আমার গোঙ্গার বয়সী। পঁচিশ বছরও পোরে নাই। তখন কি কথা মাগীর। বলে মানুষের নিন্দায় আমার কিছু যায় আসবে না। এখন হল ত! ঐ মুখটা আবার গাঁয়ে এসে দেখাচ্ছিস কেমন ক'রে? খিটকালি কাণ্ড! বলেই রহস্যপূর্ণ দৃষ্টিতে কান্দুরীর দিকে তাকিয়েই চম্‌কে উঠলো। ওমা তোমার হল কি?

কান্দুরী তাড়াতাড়ি বিবর্ণ মুখখানা নীচু ক'রে পেটটা দুহাতে চেপে ধ'রে উঠে দাঁড়ালো। সকাল থেকে খুব পেট কামড়াচ্ছে মা। বলেই ছুটে যেয়ে ঘরে ঢুকলো। সরোমণিও আসলো পিছে পিছে। কিন্তু কান্দুরী ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠলো—তোমাকে আর আসতে হবে না। নিজের কাজ কর। যাও। এখুনি সেরে যাবে। সরোমণি দাঁড়িয়ে একটু চিন্তা ক'রে বেরিয়ে এলো।

কান্দুরী বিছানায় শুয়ে পড়ে। ভুটকু নীলাকে তাড়ালো সত্যিই? তাহ'লে ত না যেয়ে উপায় নাই। এই আছিলাটাই দিয়েছিল সে। নীলাকে সত্যি ছেড়ে দেবে ভাবতে পারে নাই। ভুটকুর মত লোকের ঘর করা ভাগ্যেরই কথা বলতে হবে। দুষ্টু কি নজরেই যে দেখলো আমাকে! খুঁকী দূতীকে লাগালো পেছনে। খুঁকীদির কথাগুলো কি মিষ্টি! মুখের হাসিটা কি সুন্দর! নিজের দিদিও এমন হয় না। খুব ভাল লাগে তাকে। আমার জন্যই নীলাকে তাড়ালো ভুটকু। বেশ একটা তৃপ্তি আসছে মনে। জয়ের তৃপ্তি। খুঁকীদি বলে দিয়েছে, নীলাকে বের ক'রে দিবার পরেই ঘরের জানালায় এসে টোকা মারবে ভুটকু। গোঙ্গা ত শুনতে পায় না, তুই বেরিয়ে আসবি। সর্ব্বনাশ! আজ রাতেই ত বোধহয় আসবে। এক ক্রোশ রাস্তা অন্ধকারে একা আসতে পারবে? আমার জন্যে ও সবই পারে। শয়তান আমাকে ঘরছাড়া না ক'রে ছাড়লো না!

গোঙ্গা ঘরে ঢুকলো। হাতে ছোট বাটীতে তেল মিশানো, বোবা হ'লেও গোঙ্গার জ্ঞানের নাড়ী টনটন। দুয়ারে খিল দিয়ে এসে কাছে বসলো। পেটে তেল মালিশ ক'রবে। কান্দুরী করুণার দৃষ্টিতে চাইলো ওর দিকে। আহা বেচারী। গোঙ্গা নীরব ভাষায় আদর জানিয়ে ব'সে তেল মালিশ ক'রছে পেটে। কান্দুরী স্থির দৃষ্টিতে দেখছে ওকে। পরম তৃপ্তিতে বুকে পেটে মালিশ ক'রে চ'লেছে। মাঝে মাঝে কম্পিত শ্বাস। কান্দুরী পরিপূর্ণভাবে বিলিয়ে দিল নিজেকে। কোন বাসনাতে বাধা দিল না। ছেলেবেলা থেকে এক সাথে খেলে বেড়ে মানুষ হয়েছে ওরা, এখন বুঝছে কতখানি মায়া প'ড়েছে ওর উপর। কাল পাথর কোঁদা চেহারা, দৈহিক শক্তি সামর্থ্যে কারও চেয়ে কম নয়। বরং অনেকের চেয়ে বেশী। মৎস্যজীবি জেলে ওরা। জাল টানতে, কাঠ ফাঁড়তে কোদাল পাড়তে ওর জুড়ি কে আছে গাঁয়ে? আদর সোহাগও কম জানে না। পাড়ার ছোট ছেলে দেখলেই ঘাড়ে ক'রে নিয়ে ঘুরবে। তার বেলায়ও ত কিছু কম নাই। অথচ নিজে সামান্য আদরেই গ'লে যায়। কোন দিকে কোন ত্রুটী নাই। কেবল মাত্র বোবা আর কালা। দুটো প্রাণের কথা বলার উপায় নাই। কি করা যাবে? কপাল ওর।

প্রায় বার বছর আগে তার বাবার সঙ্গে এসেছিল এ গাঁয়ে একটা বিয়ে বাড়ীতে। তখন তার বয়স ছয় বৎসর। সেখানেই দেখলো দশ এগার বছরের গোঙ্গাকে।

আ—ও—আ—ও ক'রে অব্যক্ত ভাষার তার ভঙ্গীগুলো বড় মনোরম লেগেছিল তাকে। বিয়ে বাড়ীর দুটো দিন সব সময়ে ওর সাথেই ছিল। ওর চোখ মুখের অদ্ভুত ভঙ্গী, হাত পা

নেড়ে প্রাণের ভাষা জানানর বিচিত্র প্রয়াস দেখে তৃপ্তি মিটছিলো না। রাত্রে ওর সাথে ওদের বাড়িতেই শুয়েছিল। মনে আছে সরোমণি কোলে ক'রে মুড়িমুড়কী খাইয়ে নিজের কোলের কাছে নিয়ে শুয়ে পড়েছিল। তারপর আদরের বান ছুটিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল—

—আমার গোঙ্গাকে তোর ভাল লাগে?

সে বলেছিল—হ্যাঁ খুব ভাল লাগে।

—তা হ'লে ওকে বিয়ে করবি?

বিয়ে বাড়ীতে নতুন বউএর লালসাড়ী, রূপার গয়না দেখে নতুন বউ হওয়ার লোভ জেগেছিল মনে। আনন্দের সঙ্গে জানিয়েছিল, হ্যাঁ।

সরোমণি আর কিছু বলে নাই তাকে। পরদিন শুধু দেখলো বিয়ে বাড়ীর হাঙ্গামা মেটার পরেও বাবা এবাড়ীতে এসে থাকলো দুদিন। কত যত্ন আমাদের। পোষা হাঁস কেটে খাইয়েছিল। পিঠা পায়েস দিয়ে কত আদর যত্ন করেছিল এরা, তারপর চ'লে গিয়েছিল বাড়ী আর কিছুদিন পরেই লাল সাড়ী প'রে বউ হ'য়ে আসলো এ বাড়ীতে। গোঙ্গা এদের একমাত্র ছেলে তাই পাঁচশো টাকা পণ দিয়েই বিয়ে দিয়েছে। পরে শুনেছে সে এ কথা। আজ মা বাবা ভাই বোন কেউ নাই তার। শ্বশুরও বিদায় দিয়েছে। পরপারের ডাকে যেতে হ'য়েছে সবাইকে। শুধু এক কাকা আছে গ্রামে বাবার জ্যেঠতাতো ভাই। সেখানেই সে যায় মাঝে মাঝে সন্ন্যাসী ডাঙ্গায়। এবার যেয়েই ভুটকু আর খুঁকীদির নজরে পড়েছে। সাধারণের মধ্যেও তার অসাধারণ যৌবনশ্রী পাগল ক'রেছে ভুটকুকে। আর উপায় নাই। কিন্তু প্রকৃত ঘটনাটা মনে হতেই একটা আতঙ্ক জাগছে মনে। গোঙ্গাকে একটু আদর করে বের হ'য়ে এলো ঘর থেকে।

কান্দুরী যা ভেবেছিল তাই হ'লো। নিশীথরাতে জানালায় টোকা পড়তেই তার বুকের মধ্যে ধক্ ক'রে লাগলো। কাঠ হ'য়ে প'ড়ে রইল সে। ক্রমে জোরে ধাক্কা প'ড়ছে। বুকের কাছে গোঙ্গা ঘুমুচ্ছে অঘোরে। তার সমস্ত গায়ে একবার হাত বুলিয়ে দেখলো। কেন ছেড়ে যাব একে? বিবাহিত স্বামী। কোন সাড়া দিল না। শেষ রাত্রে চাপা কণ্ঠের আহ্বানও কানে এল। কিন্তু সমস্ত রাতই সে জেগে নিঃসাড়ে কাটিয়ে দিল।

পরদিনই খুঁকী আসলো গ্রামে, তার দূর সম্পর্কের বোনের বাড়ীতে। কান্দুরীর বাড়ী বেড়াতে আসতেই কান্দুরীর সংকল্প গেল ভেসে। খুঁকীর কৌশলী কথায় স্থির বিশ্বাস হ'লো তার গোঙ্গার সঙ্গে ঘর করে কোন সুখ নাই। গুঞ্জি নামটাই লজ্জাজনক। গোঙ্গাতে আর গরুতে কোন তফাৎ নাই। তাছাড়া দশ সমাজের সমস্ত দায়িত্ব ভুটকুই ঘাড়ে নিচ্ছে। সে রাত্রি টোকা পড়তেই নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে ভুটকুর পিছে পিছে।

সকালেই সরোমণি পাড়া তোলপাড় ক'রে খুঁজে ফিরল কান্দুরীকে। গোঙ্গা বুক চাপড়ে অব্যক্ত আর্ত্তনাদ ক'রছে। কোনখানে কোন সন্ধান না পেয়ে মাতাপুত্রে হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটলো সন্ন্যাসীডাঙ্গা। কান্দুরীকে নিজের বাড়ী নিয়ে যেতে সাহস পায় নাই ভুটকু। ও কাকার বাড়ীতেই আছে আপাততঃ। সমাজের হাঙ্গামা না মেটা পর্য্যন্ত নিতে পারবেও না। তাই অন্তরালেই

আছে সে। কান্দুরীর কাকা শ্যামদাসের বাড়ীতে হাজির হ'ল ওরা, কান্দুরী পাড়ায় কোথায় যেয়ে লুকিয়েছে। শ্যামদাসের বৌ জানিয়ে দিল কান্দুরী গোঙ্গার ভাত খাবে না, আমরা কি ক'রবো? গোঙ্গা মাথা ঠুকে কেঁদে প'ড়লো তার দুয়ারে। কান্দুরীকে না পেলে নিজের গলায় ছুরী লাগাবে সে। দর্শকরা মুখটিপে হাসছে। সরোমণি কালীর কাছে মানত করলো, দোহাই মা আমার বউ ফিরিয়ে দাও। জোড়া পাঁঠা দিয়ে তোমার পূজা দিব। পাড়ার মাতব্বরদের দুয়ারে দুয়ারে কেঁদে ফিরছে সে। ভুটকু গাঁয়ের ছেলে, অবস্থা ভালই। অনেক সময়েই ওর সাহায্য দরকার হয়। অনেকেই নিলিপ্ত সহানুভূতি জানালো শুধু। অনেক কাঁদাকাটির পর কয়েকজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি শ্যামদাসের বাড়িতে হাজির হ'লো। কিন্তু কান্দুরীর আর দেখাই পাওয়া গেল না, শ্যামদাসকে ভুটকু ভাল ক'রে হাত ক'রেছে। সে এসে বললে—ভোরে আমার এখানে এসছিল ঠিকই কিন্তু তারপরে কোথায় গিয়েছে জানি না। আমার বাড়ীতে নাই, তোমরা এসে দেখো আমার বাড়ী ঘর। সরোমণিকে সাথে ক'রে বাড়ীর মধ্যে গেল সকলে। ঘরের ভিতর, অলি গলি, ধানের মড়াই, ঘরের কোটা কোনখানেই পাওয়া গেল না তাকে। গোঙ্গা পাগলের মত মাথার চুল ছিঁড়ছে। মতি হালদার চুপে চুপে সরোমণিকে ডেকে নিয়ে যেয়ে পরামর্শ দিল—এমন ক'রে কিছু হবে না। তুই ছত্রিশের দশকে খবর দিয়ে বিচার ফেলে দে। 'বিহাতী বৌ' ভাত না খেয়ে যাবে কোথায়?

সরোমণি মাথায় হাত দিয়ে বসলো। সর্ব্বনাশ! ছত্রিশ গাঁয়ের মৎৎ প্রধানদের ডাকা আমার সাধ্য? তাদের মান সম্মান করবো কোথা থেকে? কম ক'রে দুশ টাকা না হ'লে ছত্রিশ ডাকা চলে না। এই বউ ঘরে আনতেই তো জমি যায়গা সব গিয়েছে।

—তা হ'লে এখন চুপ ক'রে থাক। বছর অন্তে ছত্রিশ যখন আপনিই বসবে তখন যেয়ে নালিশ করিস। আর না হয় থানা কর।

সেটাও সরোমণির মনঃপুত হয় না। থানার দারোগাবাবু আসলে তারও হাঙ্গামা কিছু কম নয়। তাছাড়া টাকার জোর যে দিকে বেশী থানাও সে দিকে গড়ে যায়। ছত্রিশ বসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'রতে হলে যত দিন যাবে ততই যেন দাবীর জোর ক'মে আসবে। গাঁয়ে যেয়ে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে বুঝে কর্ত্তব্য ঠিক ক'রবে ব'লে ফিরে চললো সে। গোঙ্গা যেতে চায় না। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে গোঙ্গাকে বুঝাল, বউ আমাদের গাঁয়ে গিয়েছে। সেখানে বেয়ে ধ'রে নিয়ে যাবো। গোঙ্গা আর কোন আপত্তি ক'রলো না যেতে।

গ্রামের লোকের সাহায্য চাইলো সরোমণি। কিন্তু বউ যখন লুকিয়েছে, গাঁয়ের মানুষ কি ক'রবে? কোথা থেকে বেরোচ্ছে দেখা যাক, তখন ব্যবস্থা করা যাবে। কদিন লুকিয়ে থাকবে বাছাধন। সরোমণিকে অগত্যা চুপ ক'রে থাকতে হ'লো। শ্যামদাসের বাড়ীতেই আছে, কোন সন্দেহ নাই কিন্তু সেখানে যেতে গেলেই খবর পোছে যাবে আগে আর লুকিয়ে প'ড়বে কোথায়। শত্রুদের দিন প'ড়ে গিয়েছে তো—।

সেদিন সকালে গোঙ্গা বারান্দায় ব'সেছিল। অনাহারে অনিদ্রায় আধমরা চেহারা।

মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। শুধু চোখ দুটো ঠেলে উঠেছে। হতাশ দৃষ্টির হাহাকার। উ—করে মাঝে মাঝে একটা অব্যক্ত আর্ত্তনাদ। সরোমণিও ওদিকের বারান্দায় ব'সে ভাবছিল। গোঙ্গারই ভবিষ্যৎ। গোঙ্গা ধীরে ধীরে কাছে এসে বসলো। তার মনের কথা, চোখের ভাষা একমাত্র সরোমণিই বোঝে। সুখ দুঃখ সরোমণিকেই জানায়। কাছে ব'সে হাতের ইসারায় জানালো, চল মা আমরা বউএর পায়ে ধ'রে নিয়ে আসি। এখানে এসে কিছুদিন ঘর সংসার করুক। কোলে ছোট ছেলে আসলে আমরা মা বেটায় ছেলেটাকে বুকে ক'রে নিয়ে থাকবো। ও গোঙ্গার ভাত যদি নাই খায় তখন যেন চ'লে যায়।

—হায় রে মোর কপাল! সরোমণি তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধ'রে ডুকরে কেঁদে উঠলো। একটু পরেই সরোমণি শক্ত হ'য়ে নিল। ছত্রিশ গাঁয়ের লোক না ডাকতে পারি পাঁচ গাঁয়ের মৎৎ প্রধানের কাছে কেঁদে প'ড়ে যা হয় ব্যবস্থা ক'রতেই হবে। না হলে গোঙ্গা আমার ম'রে যাবে।

সকাল ক'রে খেয়ে দেয়ে মায়ে বেটায় বেরিয়ে প'ড়লো গ্রামে গ্রামে। সন্ধ্যার মধ্যেই পাঁচ গাঁয়ের কয়েকজন মৎৎ প্রধান এনে হাজির ক'রলো বাড়ীতে। গ্রামের লোককেও এবার সচেতন হ'তে হয়। ভোররাত্রে সন্ন্যাসীডাঙ্গা রওনা হল একটা বড় দল। অতর্কিতে শ্যামদাসের বাড়ী ঘেরাও ক'রতেই শ্যামদাস কান্দুরীকে বের করে এনে দিল। পাঁচ গাঁয়ের সঙ্গে লাগা মানেই ছত্রিশের সঙ্গে লাগা। অতবড় বুকের পাটা তার নাই। ভুটকু অন্তরালেই আছে। গ্রামের হরিতলার ঝাকড়া বটগাছতলাতেই বিচার বসলো। বিহাতী বৌ স্বামীর ভাত খাবে না এ কোন দেশী কথা? ও কেন পালিয়ে এসেছে তার জবাব দিক।

কান্দুরী বেশ শক্ত হ'য়েছে দেখা গেল। থুঁকীদির শিখান মত বললে—আমি গোঙ্গার ভাত খাব না। যদি জোর ক'রে আমাকে গোঙ্গার ঘর ক'রতে হয়, তবে ফাঁস লাগিয়ে ম'রবো।

—কার ভাত খেতে চা'স তুই? একজন মৎৎ জিজ্ঞাসা করে।

—আমি গোঙ্গার ভাত খাবনা।

—ও সব আহ্লাদের কথা চলবে না। গোঙ্গার ভাত খাবি না ওর গতি কি হবে?

—আপনারা দশ ঠাকুরেরা ওর গতি ক'রবেন, আপনাদের ত অনেকের মেয়ে আছে ঘরে।

সতীশ মৎৎ রুখে উঠলো, 'চিল্লোকের' এত বড় কথা? স্বামীর ভাত খাব না। এদের ওষুধ কাঁচা কঞ্চি।

সকলে উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছে, একজন বললে—এরকম ক'রলে আমরা কেউ বউ নিয়ে ঘর ক'রতে পারবো না। ঠ্যাং ভেঙ্গে দিয়ে শিক্ষা দেওয়া দরকার।

সতীশ হুকুম দিল গোঙ্গাকে—তোর বউ এর হাত ধরে নিয়ে চল আমাদের সঙ্গে। সরোমণি তাকে বুঝিয়ে দেয়।

গোঙ্গা সে দিকে পা বাড়াতেই কান্দুরী তীব্র বেগে ছুটে যেয়ে কাছের পাড়াটায় ঢুকে প'ড়লো। বহু খোঁজাখুজি করেও তাকে আর পাওয়া গেল না।

মহৎ প্রধানেরা চরম অপমানিত হ'য়ে শাসিয়ে গেল কান্দুরী যার বাড়ীতে যার সংশ্রবে থাকবে তাকেই ছত্রিশের বিচারে দণ্ড পেতে হবে। ছত্রিশের হাজার চোখ। আর যদি মঙ্গল চায় কান্দুরী তিনদিনের ভিতর গোঙ্গার বাড়ীতে হাজির হ'বে যেয়ে।

ভুটকুর মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। ব্যাপার এতখানি গড়াবে সে ভাবে নাই। কান্দুরী কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকার পর ঘটনাটা একটু চাপা প'ড়লেই তাকে বাড়ীতে আনবে। ছত্রিশের বিচারে হাজির হ'য়ে-দুশো তিনশো জরিমানা দিলেই মিটে যাবে ব্যাপারটা। কিন্তু অন্য রকম হ'য়ে গেল। দশের বিধান ছত্রিশের বিধান একই। নিশীথ রাত্রে একটা ঘরে ভুটকু কান্দুরী আর খুঁকী বসে আছে। বেশ একটা টানাপোড়ন চলছে সেখানে।

ভুটকু বললে—এমন যে হবে ভাবতেই পারি নাই। তোর জন্যে কি না ক'রলাম।

—আর আমি? কান্দুরী ফুঁসে উঠলো। তোমার জন্যে ভরা দেশে কলঙ্ক নিলাম। এখন আমার কি করছো কর। এমুখ আর ও গাঁয়ে দেখাতে পারবো না।

ভুটকু বললে—আমি কম ক'রলাম তোর জন্যে? শীলাকে তাড়ালাম কার আশায়? আমার একুল ওকুল দুকুল গেল।

—দুকুল যাবে কেন? 'বিহিত' কর।

ভুটকু একটু চিন্তা করে বললে—কি বিহিত ক'রবো? দশের বিধান। কান্দুরী বললে—চল এ সমাজ ছেড়ে দূরে চলে যাই আমরা।

ভুটকু ম্লান হাসি হাসলো—পাগলী! বাড়ীঘর "আপ্তবন্ধু" বিষয় আশয় ছেড়ে কোথায় যেয়ে রিফুজি হব? শুকিয়ে মরতে হবে যে।

কান্দুরীর বেশ ঘা লাগে মনে। তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললে—দেশ সমাজ ছাড়তে পারবে না তো আমার পেছনে লেগেছিলে কেন? আমাকে কুল ছাড়ালে, মুখে কালি মাখলাম, কোন কথা আমি শুনছিনা। আমাকে কি ক'রবা কর। না হ'লে হাটের মধ্যে গলায় গামছা লাগাবো তোমার। আমি দরিয়াতে পা দিয়েছি, তোমাকে অমনি ছাড়বো?

খুঁকী গালে হাত দিয়ে বসেছিল। কান্দুরী তাকে এবার চেপে ধরলো—খুবতো কুটনীপনা ক'রে আমাকে ঘর ছাড়ালি এখন কি ক'রবি কর না হ'লে ছত্রিশের বিচারে তোকে হাজির ক'রবো।

খুঁকি গালে হাত দিয়ে ভাবছিল। অতীত জীবন তার নিষ্কলুষ নয়, বরং অনেক সঞ্চয় আছে সেখানে। জীবনের ক্ষুধা পরিপূর্ণভাবে মিটিয়েছে সে তার নিঃসঙ্গ জীবনে, আজ তার নারীত্ব স্তিমিত। তাই অপরকে আনন্দ দিয়ে নিজে আনন্দ পায়। আর্থিক বিচারে বিচার করে না। এমনটা হবে সেও ভাবতে পারে নাই। কান্দুরীর ভাবভঙ্গীতে সে চিন্তিত হয়ে পড়লো। দাগ তার যতই থাক, গ্রামে তার মান সম্মান প্রতিপত্তি কম নয়। অসুখ বিসুখ বিয়ে শ্রাদ্ধ সব ব্যাপারেই বুক দিয়ে পড়ে সে অনাহুত ভাবে। এই ঘটনা ছত্রিশের কানে গেলে দণ্ডের চেয়ে দুর্নাম কলঙ্কের ভয়ে সে শিউরে উঠলো। কান্দুরীর তো ভালই করতে চেয়েছিল; এখন তারই কাছ থেকে কুটনী নাম শুনতে হ'চ্ছে।

কান্দুরী তাড়া দিল—খুঁকীদি কি করছিস বল।

—একটা পথ আছে পারবি?

কান্দুরী ভুটকু উভয়েই আগ্রহে ঝুঁকে প'ড়লো, খুঁকী ফিস্‌ফিস্ ক'রে মতলবটা বুঝিয়ে দিল। কান্দুরী দশের হুকুম মতই তিনদিনের মধ্যে গোঙ্গার বাড়ী যেয়ে হাজির হবে। যেন কিছুই হয় নাই এমনভাবে চলবে কয়েকদিন, তারপর সে যে অষুধটা দিবে সেটা খাওয়ার জলের সঙ্গে খাইয়ে দিবে। তিনটা দিন খাওয়াতে পারলেই বাছাধনকে আর ভবের খেলা খেলতে হবে না। গোঙ্গা মরে গেলে আর তাকে কে আটকাবে?

কান্দুরী শিউরে উঠে দাঁত চেপে বসে রইল চুপ ক'রে। ভুটকু তার হাত চেপে ধ'রেছে, এ এ তোকে করতেই হবে কান্দুরী। বল পারবি কি না? কান্দুরী তাকালো তার দিকে। চকিতে সরোমণির চেহারাটা ভেসে উঠলো মনে; কিন্তু জোর ক'রে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বললে—তোমার জন্য না কোরে উপায় কি? পারবো। ঠিক হ'লো আগামী কাল সন্ধ্যায় খুকী ওষুধ এনে দিবে। পরের দিন ভোরের আগেই কান্দুরী চলে যাবে গোঙ্গার বাড়ী।

পরদিন দুপুরে খাওয়ার পরই কান্দুরী সব বমি ক'রে ফেললো। ভয়ানক গা ঘাঁটছে। শুধু আজ নয় কিছুদিন থেকেই যেন খাওয়ার পর পর বমি বমি লাগে। গত কালও সে বমি ক'রেছিল। শরীর অহেতুক দুর্বল লাগে। দৈহিক অসুত বৈরুব্য মনে হয় তার। পাশের বাড়ীতেই অমিয় ডাক্তার এসেছিল রোগী দেখতে। শ্যামদাসের স্ত্রী চুপ করে ডেকে আনলো ডাক্তারকে, সুপরিচিত হাসিখুসি লোক, বয়সে প্রবীণ। কান্দুরীকে দেখলো ভাল ক'রে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কথা শুনলো ডাক্তার। তারপর গম্ভীর ভাবে বললে, ব্যাপার সাংঘাতিক। আঁৎকে উঠলো কান্দুরী। শুকনো গলায় জিজ্ঞাসা ক'রলো, কি অসুখ ডাক্তারবাবু? মিটি মিটি তাকাচ্ছে ডাক্তার। চোখে দুষ্ট হাসি, বললে—মা হ'তে চ'লেছো তুমি। কান্দুরী হয়ত ঠিক বোঝে না কথাটা, ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

তারপর বুঝতে পেরে কান্দুরীর ফ্যাকাশে মুখখানায় সিঁদুরের আভা লাগে যেন। তাড়াতাড়ি মুখ নামালো সে। অদ্ভুত শিহরণ সারা দেহে। মা হবে সে। জীবনের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিয়েছে। ছোট শিশু বুকে চেপে আদর যত্নে বড় ক'রে তুলবে। ডাক্তার চলে যেতেই ঘরে যেয়ে শুয়ে পড়লো।

পেটে ছেলে আছে। গোঙ্গারই ছেলে। হঠাৎ গোঙ্গার উপর মমতায় তার হৃদয় ভ'রে গেল। গোঙ্গার ছেলের খুব সখ। সেই ছেলে আজ তার পেটে। তার কোলে ছোট শিশু দেখে গোঙ্গার কি আনন্দই হবে। কত আদর করবে, কোলে নেবে চুমু খাবে। বেশ আনন্দে সারা বিকেলটা কাটিয়ে দিল সে। গোঙ্গা তা হ'লে ছেলের বাপ্ হ'লো? গোঙ্গা হ'লেও শয়তানীতে তো কম নয়! হবে না?

সন্ধ্যার পর খুঁকী আসলো কোথা থেকে হাঁফাতে হাঁফাতে। একটা মোড়ক হাতে দিয়ে বললে—এই নে খুব সাবধানে রাখবি। কেউ যেন না জানে। দিন কয়েক ঘর করার পর দিবি

জলের সঙ্গে মিশিয়ে। কত সাধ আমার তুই ভূটকুর ঘর আলো ক'রবি। তোদের মুখের দিকে তাকিয়ে আর থাকতে পারলাম না। আমার ইমান নষ্ট করিস না। ছোট মোড়কটা হাতে গুঁজে দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল সে।

সমস্ত রাত দ্বিধাদ্বন্দ্বে জেগেই কাটিয়ে দিল কাদুরী। ভূটকুর ঘর আলো করা খুকীদির সাধ! এদিকে গোঙ্গার ছেলে পেটে। খুকীদির কথাগুলো টানছে তাকে বারে বারে। হঠাৎ সে সোজা হ'য়ে উঠে বসলো। একটা কথা কনে বৌ দিয়েছে 'যদি হই সতী কি ক'রবে দুতী?' উত্তেজনায় দুয়ার খুলে বের হ'য়ে এলো, পুবদিকটা ফিকে হ'য়ে এসেছে। দূরে কোথায় মুরগী ডেকে উঠল কুকুরর—কু—

ওঃ ভোর হয়ে এসেছে। তাড়াতাড়ি গোঙ্গার বাড়ী ছুটলো। খুকীর দেওয়া মোড়কটা জলে ফেলে দিয়েছে সে।

ব্যালে নৃত্য প্রসঙ্গে

দীপ্তি ত্রিপাঠী

নৃত্যশিল্প মানুষের আদি ইতিহাসের মতই প্রাচীন। কিন্তু ব্যালে নাচের সুরু হয় প্রথম ফ্রান্সের রাজদরবারে। ফরাসী সম্রাট প্রথম ফ্রান্সিস ষোড়শ শতকে একবার ইতালী পরিভ্রমণে যাত্রা করেন। সেই সময় ইতালীতে একরকম মুখোস অভিনয়ের প্রচলন ছিল। অভিজাতদের ভোজসভায় কিংবা কোন সম্মেলনে অভিনেতারা মুখোসের ছদ্মবেশে দেবতা কি মেষপালক কিংবা পুরাণ-প্রসিদ্ধ কোন বীর সেজে হঠাৎ উপস্থিত হয়ে সঙ্গীত বা নৃত্য করে অভ্যাগতদের মনোরঞ্জন করতেন। উৎসবের সময় এই ধরণের অভিনয় অনেক সময় পথের মধ্যেও হোত। রাত্রির অন্ধকারে —মশালের আলোয়—যন্ত্রীদের সুরের সঙ্গে যখন তাঁরা নৃত্য করতেন তাও কম চিত্তাকর্ষক ছিল না। ফ্রান্সিস এই ধরণের অভিনয় দেখে এত খুশী হলেন যে ফ্রান্সেও তার প্রচলন করতে চাইলেন। তাই দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করবার সময় একদল শিল্পী ও যন্ত্রী সংগ্রহ করে নিয়ে এলেন। ফরাসী রাজদরবার সাগ্রহে এই নতুন শিল্পটি গ্রহণ করল। এই হোল পাশ্চাত্যের ব্যালে নাচের সূত্রপাত।

১৮৫১ খ্রীঃ এই শিল্পের একটি প্রদর্শনী হোল। যদিও তার নাম Le Ballet Comique de la Reine—কিন্তু তাকে ঠিক ব্যালে বলা চলে না। কারণ তাতে নাচ, মূকাভিনয়, অভিনয় সবই মিশ্রিত ছিল। তবুও এর মধ্যে যে বিস্তৃত দৃশ্যপট, উজ্জ্বল সাজসজ্জা, হীরামুক্তার গহনার ব্যবহার হয়েছিল তাতে সে যুগে একে অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা বলেই লোকে বহুদিন মনে রেখেছিল। তৎকালীন যুগের যে সব বিবরণী পাওয়া যায় তার থেকে জানা যায় যে এই অভিনয় রাত্রি দশটায় সুরু হয় এবং শেষ হয় রাত্রি সাড়ে তিনটেয়। কিন্তু দর্শকবৃন্দ সেজন্য মোটেই ক্লান্ত বা অসন্তুষ্ট হয় নি।

সম্রাট ও তাঁর পারিষদবর্গ প্রায়ই এই ধরণের অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতেন। গল্প-কাহিনীগুলিও প্রধানতঃ গ্রীক উপখ্যান থেকে নেওয়া হোত। আধুনিক ব্যালের সঙ্গে তার ঠিক মিল ছিল বলা চলে না। কারণ নাচের অংশ ছিল অত্যন্ত সরল ও সহজ পদবিন্যাস এবং অনেক সময়ই ঠিক নাচ না বলে বলা চলতো রাজকীয় প্যারেড। অবশ্য এই ধরণের কৃত্রিম চলাফেরার অন্যতম কারণ অভিনেতৃবর্গের দরবারী পোষাক। সেই রাজকীয় পোষাকগুলি এত ভারী এবং এত বিরাট ছিল যে তা পরে সহজে চলাফেরা প্রায় অসম্ভব ছিল। এখনকার যুগের ক্ল্যাসিকাল ব্যালে নাচে যেমন "স্লিপিং বিউটি"র দরবারের দৃশ্যে এই ধরণের রাজকীয় চলা ফেরা এখনও দেখা যায়।

এই শিল্প এত বেশী জনপ্রিয় হয়েছিল যে ১৬৬১ খ্রীঃ চতুর্দ্দশ লুই একটি ব্যালে স্কুল প্রতিষ্ঠা করবার কথা স্থির করেন। এখনো পর্য্যন্ত প্যারিসে এই নৃত্য একাডেমী প্রতিষ্ঠিত আছে। রাজশিক্ষক বোসাঁ এইখানেই শেখাতে সুরু করেন। তাঁর প্রবর্ত্তিত পাঁচটি পদক্ষেপ এখনো ক্ল্যাসিক্যাল ব্যালেতে শেখান হয়। ক্ল্যাসিক্যাল ব্যালের উৎপত্তি গ্রীক নৃত্যধারা নয়—

এই একাডেমীর নৃত্য শিক্ষারই বিবর্তনের ফলে ক্ল্যাসিক্যাল ব্যালের সৃষ্টি। রোমান্টিক ও আধুনিক ব্যালেও ক্ল্যাসিক্যাল ব্যালের অঙ্গহার ও পদক্ষেপ দিয়েই রচিত।

অষ্টাদশ শতকের মধ্যপাদে একজন প্রধানা ব্যালে নর্ত্তকীর আবির্ভাব হয়। তাঁর নাম লা কামার গো। তিনিই প্রথম ব্যালের জটিল পদক্ষেপগুলি সুরু করেন। এত স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে তিনি নাচতেন এবং তাঁর পায়ের কাজগুলি এত সুন্দর হোত যে সেগুলি দেখাবার জন্য তিনি রাজকীয় বিরাট পোষাকগুলি ছেঁটে ছোট করে নিলেন। অবশ্য সে জন্য তৎকালে যথেষ্ট হৈ চৈ হয়েছিল। যাই হোক তিনিই প্রথম আকাশে পদক্ষেপের ভঙ্গী যেটি ব্যালে নাচের একটি প্রধান পদভঙ্গী তার সুরু করেন। তাছাড়া তিনিই প্রথম গোড়ালী দেওয়া ভারী জুতো ছেড়ে গোড়ালিবিহীন নরম চটির মত ব্যালে জুতো পরার পত্তন করেন। লণ্ডনে ওয়ালেস সংগ্রহে এই নর্ত্তকীর একটি কৌতূহলদ্দীপক চিত্র এখনো আছে। সেখানে দেখা যায় তিনি কি করে পায়ের আঙ্গুলের উপর দাঁড়িয়ে অতি কঠিন ব্যালে বৃত্ত রচনা করছেন।

ফরাসী দেশের নৃত্যশিক্ষক ও শিল্পীরা এরপর ক্রমশঃ সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়লেন এবং তাঁদের বিদ্যা ও নৃত্যশৈলী অন্যদেশের শিল্পীদের শেখাতে লাগলেন। ১৭৩৫খ্রীঃ একজন ফরাসী শিক্ষক রাশিয়ায় পৌঁছলেন এবং সম্রাজ্ঞী এ্যান প্রতিষ্ঠিত সেণ্টপিটার্সবার্গের (অধুনা লেলিনগ্রাদ) রাজকীয় নৃত্যশিক্ষালয়ের অন্যতম প্রধান শিক্ষক হলেন। পরবর্ত্তী যুগে এই কেন্দ্রেই ব্যালে নাচের সর্ব্বপ্রধান শিক্ষালয় হয়ে উঠেছিল। নৃত্যশিল্পীরা তাঁদের পোষাকগুলি আরো সরল ও সহজ এবং নৃত্যভঙ্গিমার উপযোগী করতে সুরু করলেন। ব্রোকেড ও ভেলভেটের ব্যবহার না করে তাঁরা হাল্কা ও কোমল পোষাক ব্যবহার সুরু করলেন। কারণ তাতে উল্লম্ফন প্রভৃতি পদভঙ্গী দেখানো অনেক সহজ হোত। অগস্তে ভেস্ত্রি এই ধরণের উল্লম্ফনে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি ছিলেন প্যারিস একাডেমীর ছাত্র। তাঁর নৃত্যভঙ্গী ও লাবণ্যের তুলনা ছিল না। এ যুগে আবার নর্ত্তকরা নর্ত্তকীদের চেয়ে অধিক প্রাধান্য তথা সম্মান পেতেন এবং ভেস্ত্রি বিশেষ করে সে সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। একবার একটি নর্ত্তকী তাঁর পা মাড়িয়ে ফেলবার জন্য দুঃখিত হয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করে, তার উত্তরে ভেস্ত্রি অত্যন্ত রেগে উত্তর দিয়েছিলেন—"ম্যাডাম, ক্ষমা চাইবার কিছু নেই, তুমি তো আর আমাকে আঘাত করনি, সমগ্র প্যারিস নগরীকে এক পক্ষের জন্য শোকের নগরী করেছ।" অবশ্য তাঁর এই গর্ব্বের যথেষ্ট কারণও ছিল, তিনি এত সুন্দর নাচতেন এবং যেখানেই যেতেন সেখানেই তা এত সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করতেন যে লোকের চোখে তাঁকে মনে হোত নৃত্যের দেবতা।

আর একজন প্রধানা ব্যালে নর্ত্তকী ছিলেন মেরী তাগলিওনি। ইনি ব্যালে নৃত্যের অনেক কৃত্রিমতা ঘুচিয়ে তাকে করে তুললেন স্বাভাবিক ও সহজ। ব্যালে নাচের অতীন্দ্রিয় রূপও তিনিই দেন। তাঁর যুগটাই অবশ্য ছিল রোম্যান্টিক যুগ। ১৮০৪ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এই যুগের গল্প প্রভৃতিতে তখন একটা কাব্যিক পরিবেশ রচনা করা হোত। নায়িকারা হতেন অপূর্ব্ব সুন্দরী। নায়ক হতেন কোন প্রেমান্ধ রাজপুত্র অথবা কবি। তাঁরা দুর্গম কোন

বনভূমি অথবা রহস্যময় কোন দুর্গে প্রেমিকার জন্য প্রবেশ করতেও দ্বিধা করতেন না। গল্পের অবসান কিন্তু প্রায়ই হোত প্রেমিক ও প্রেমিকার বিচ্ছেদের করুণ রসে।

তাগলিওনির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ব্যালে নাচে পুরুষ-প্রাধান্যের যুগ শেষ হোল। তাঁদের বীররসাত্মক শৈলী আর লোকপ্রিয় থাকল না। অন্যদিকে তাগলিওনিকে মনে হোত চাঁদের আলোর সত্তার মত অমনি কোমল, মধুর। তাঁর নাচ এত লঘু, তাঁর অঙ্গহার এমন সুকুমার ও লীলায়িত ছিল যে মনেই হোত না এই পৃথিবীর ভূমির সঙ্গে তাঁর কোন যোগ আছে। এত সহজে উল্লম্ফনগুলি করতেন যে মনে হোত তিনি বাতাসে ভেসে যাচ্ছেন। তাগলিওনিই প্রথম ব্যালে নাচে সাদা রংয়ের পোষাকের পত্তন করেন। অতি স্বচ্ছ কাপড় পরতের পর পরতে দিয়ে হাঁটু এবং গোড়ালীর মধ্যবর্ত্তী পর্য্যন্ত এই স্কার্ট বা ঘাগরা থাকত। তাগলিওনি এত জনপ্রিয় ছিলেন যে একবার সেণ্টপিটার্সবার্গে ভক্তবৃন্দরা তাঁর গাড়ীর ঘোড়া খুলে ফেলে নিজেরা সে গাড়ী টেনে নিয়ে গিয়েছিল। সমস্ত মহৎ শিল্পীদের মতই তিনিও কঠিন সাধনা ও ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিয়ে লাভ করেছিলেন কৃতকার্য্যতা—অনেক বেদনা ও অশ্রুজলের শেষে পৌঁছেছিলেন সিদ্ধির পথে।

রাশিয়াতে জারদের আমলে ব্যালে একটি প্রধান কলাবিদ্যা হয়ে ওঠে। সেণ্টপিটার্সবার্গে ইম্পিরিয়াল ব্যালে স্কুলে ফরাসী শিক্ষকেরা ইতালীয় নৃত্যশিল্পীদের খুব পছন্দ করতেন কারণ তাঁরা যে কোন নতুন প্রকরণ অতি সহজেই আয়ত্ত করতে পারতেন। সুতরাং প্রায়ই ইতালীয় শিল্পীদের রাশিয়ায় আমন্ত্রণ করা হোত। অতএব এইভাবে ফরাসী সৌকুমার্য্য ও লীলায়িত ভঙ্গী, ইতালীয় বলিষ্ঠতা ও মেধা এবং রাশিয়ান নিষ্ঠা ও জন্মগত নৃত্যস্পৃহা মিশ্রিত হয়ে জন্ম দিল এক অপরূপ ব্যালে নৃত্যের যা "রাশিয়ান ব্যালে" নামে ভুবন বিখ্যাত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে দেখা গেল জারের অন্যতম বহুমূল্যবান সম্পদ হোল এই নৃত্যরীতি। তাঁরা অবশ্য এই কলাবিস্তার জন্য যেরকম প্রভূত অর্থ ব্যয় করতেন সে রকম খুব কম কলাবিদ্যাই পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে। সেণ্টপিটার্সবার্গের ম্যারিনস্কি থিয়েটরে যে সব ব্যালে দেখান হত সেগুলি এখনো পর্য্যন্ত অত্যাশ্চর্য্য সৃষ্টি। এই যুগেই বিখ্যাত ক্ল্যাসিক্যাল ব্যালেগুলির উদ্ভব; লে ল্যাক দু সাঁয়ো, স্লিপিং বিউটি প্রভৃতির সৃষ্টি এই যুগেই। বিখ্যাত সুরস্রষ্টা চাইকোভস্কির কতকগুলি শ্রেষ্ঠ রচনা এই ব্যালেগুলিকে কেন্দ্র করেই লিখিত হয়। সে যুগে যাঁরা নৃত্যশিল্পী ছিলেন তাঁদের নাম আজ রূপকথায় পরিণত হয়েছে, যেমন পাবলোভা, নিজনিস্কি, ফোকইন ইত্যাদি। এঁরা সকলেই ছিলেন ম্যারিনিস্কি থিয়েটরের শিল্পী। আজকের দিনে সমালোচকদের কাছে ব্যালে নাচের প্রসঙ্গ মানে এঁদেরই প্রসঙ্গ; এমনিভাবে এঁরা ব্যালে নাচের সঙ্গে ওতোপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছেন।

এক রাত্রে ইতালীয় নর্ত্তকী লেগনানি ম্যারিনস্কি থিয়েটরের দর্শকদের স্তম্ভিত করে দিলেন বত্রিশটি ফয়েট বা বৃত্তের সঙ্গে পদশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। দর্শকবৃন্দ তাতে এত অভিভূত হয়ে পড়ে যে শেষ পর্য্যন্ত রাশিয়ার প্রধানা নর্ত্তকী ম্যাটিল্ডা ক্ষেশিংকা মঞ্চে উঠে দেখান যে তিনিও এই অতি

কঠিন পায়ের কাজটি দেখাতে পারেন। বলাবাহুল্য ম্যারিনস্কি থিয়েটরে সেদিন এক আনন্দ, বিস্ময় উত্তেজনার প্রবল প্রবাহ বয়ে গিয়েছিল। অবশ্য আজকাল অনেক নৃত্যশিল্পীই এই সুকঠিন কাজটি আয়ত্ত করেছেন কিন্তু এখনও এটি একটি সাধনার বস্তু।

পরবর্ত্তী যুগে ক্রমশঃ টেকনিকের বা প্রকরণের উপর জোর দেওয়া সুরু হয়। নর্ত্তকীদের মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতা চলত প্রকরণের নানা সূক্ষ্ম ও জটিল কৌশল নিয়ে। দর্শকেরা বসে বসে গুণতেন তাঁদের প্রিয় নর্ত্তকীরা কতবার বৃত্তের সঙ্গে পদশৃঙ্খলা রচনা করতে পারেন অথবা কবারই বা পারেন ব্যালেরিনা রচনা করতে। ম্যারিনস্কি থিয়েটরে সিট পাওয়া ক্রমে ক্রমে দুর্লভ হয়ে ওঠে। কারণ রাত্রির পর রাত্রি ধরে একই দর্শক একই আসনের টিকিট কিনতে লাগলেন। বক্সগুলি তো প্রায় পারিবারিক সম্পত্তির মত ছিল। এক একটি পরিবার পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগদখল করতেন। পিতার মৃত্যুর পর পুত্র উত্তরাধিকার সূত্রে পেত এই বক্সের অধিকার এবং বলাবাহুল্য সে অধিকার অত্যন্ত প্রার্থনীয় বলে মনে করা হোত। তখনকার দিনে ব্যালে মানে ছিল একটি সমাজ—সেখানে দেখা সাক্ষাৎ হোত, সামাজিকতা চলত। শিল্পীর সঙ্গে শিল্পীর, যন্ত্রীর, লেখকের মিলনকেন্দ্র ছিল এই ব্যালে নাচ। এঁদেরই একটি ছোট দল পরে বিদ্রোহ করে যে নতুন রীতির প্রবর্ত্তন করেন তারি নাম মডার্ণ ব্যালে। এই ক্ষুদ্র বিদ্রোহী দলের নেতা ছিলেন সার্জ দিয়াগিলভ। এঁরা গতানুগতিক ব্যালের অতি দীর্ঘ ও জটিল তথা একঘেয়ে পরিবেশনে বিরক্ত হয়ে ব্যালে নাচের সীমা প্রসারিত করতে চাইলেন, চাইলেন ব্যালেকে যুগোচিত রূপ দিতে। কিন্তু দিয়াগিলভের নব পরিকল্পনা সেন্টপিটার্সবার্গের দর্শকদের মনঃপুত হোল না। রাজকল্পারা যে আধুনিক এডোয়ার্ডিয়ান বেশভূষা পরে অবতীর্ণ হচ্ছেন এটা তাঁদের দৃষ্টিকটু লাগল। অতএব দিয়াগিলভ প্যারিস যাত্রা করলেন। তাঁর নৃত্য সম্প্রদায়ে ছিলেন পাবলোভা, ফোকইন, নিজনিস্কি ইত্যাদি জগৎপ্রসিদ্ধ শিল্পীবৃন্দ। ১৯০৯ সালে প্রায় তিন শতাব্দী পর প্যারিসে সেই শিল্পই প্রদর্শিত হোল যা ছিল চতুর্দ্দশ লুইএর স্বপ্ন। তাঁদের নৃত্য পশ্চিম ইউরোপে যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি করল। কারণ রং, সুর, ভঙ্গীর এমন অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ ইতিপূর্ব্বে আর হয়নি—তাছাড়া পরিকল্পনার অভিনবত্ব দর্শকবৃন্দকে চমকিত কোরল। আর সেই সঙ্গে সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ল দিয়াগিলভ সম্প্রদায়ের নাম।

এই দলের মধ্যে ফোকইন ছিলেন কোরিওগ্রাফার অর্থাৎ পায়ের কাজগুলি (step) তিনিই শেখাতেন। গতানুগতিক প্রথা বর্জন করে অথচ ব্যালের ঐতিহ্যটি বজায় রেখে তিনি পদক্ষেপ গুলিকে সৃষ্টি করলেন নতুন যুগের নতুন কল্পনাকে রূপ দেবার জন্য। বলতে গেলে আধুনিক ব্যালের জন্ম একরকম তাঁরই হাতে হোল। পাবলোভা অবশ্য এই দলের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিভাময়ী ছিলেন। তাঁর সেই অপরূপ নৃত্য দেখবার সৌভাগ্যবন্ত বহুলোক এখনো এই ভারতবর্ষেও জীবিত আছেন। আর এ যুগের অন্যতম প্রতিভাবান নর্ত্তক হলেন নিজনিস্কি। পুরুষ নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে তাঁর মত নাচিয়ে স্বল্পই জন্মগ্রহণ করেছেন। অতি কঠিন পদক্ষেপও তিনি অনায়াসে আয়ত্ত করতে পারতেন এবং উল্লম্ফনে তাঁর জুড়ি সে যুগে কেউ ছিল না।

আধুনিক যুগে রাশিয়াতে বলশই থিয়েটরের অন্যতম প্রধান নৃত্যশিক্ষক ফারমানিয়েজ যখন লণ্ডনে নৃত্যপ্রদর্শনীতে অদ্ভুত উল্লম্ফন দেখান তখন আমাদের চরম বিস্ময় দেখে একজন সমালোচক নিজনিস্কির ঐতিহ্যকে স্মরণ করতে বলেন। বাস্তবিক রাশিয়ার নৃত্যশিল্পীরা হাওয়ার উপর নাচ দেখান, মাটিতে নয়। নিজনিস্কির অদ্ভুত কৌশল দেখবার জন্য সে যুগেও অনেক শিল্পী রঙ্গমঞ্চের উপরে গিয়ে উইংস থেকে নাচ দেখতেন আসল কায়দাটি আবিষ্কারের জন্য। কিন্তু হায়! সে কৌশল ছিল তাঁর দেহের অঙ্গে প্রত্যঙ্গে—তাঁর বহুদিনের অধ্যবসায়ে—কোন ইন্দ্রজালের মধ্যে নয়। নিজনিস্কিকে একবার এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হোলে তিনি নাকি খুব সহজে বলেছিলেন—"এতে অসুবিধার কি আছে? তুমি শুধু ওপরে লাফিয়ে উঠবে এবং কেবল সেখানে কিছুক্ষণ থেকে যাবে।" বলাবাহুল্য এ ব্যাখ্যাতেও সে রহস্যের তল পাওয়া গেল না।

ইংল্যাণ্ডের নিনেত দি ভ্যালয়, এলিসিয়া মারকোভা, এ্যাণ্টন ডলইন দিয়াগিলভের সম্প্রদায়ে যোগ দিলেন রাশিয়ান রীতি শেখবার উদ্দেশ্য নিয়ে। এজন্য তাঁরা আপন নাম পর্য্যন্ত বিসর্জন দিয়ে রাশিয়ান নাম গ্রহণ করলেন। কারণ প্রচলিত ধারণা ছিল ইংরেজরা নাচতে জানে না। ১৯২৯ সালে দিয়াগিলভের মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর সম্প্রদায় ভেঙ্গে গেল। সে সময় প্রত্যেকেই ভেবেছিলে পশ্চিম ইউরোপে রাশিয়ান ব্যালের অবসান ঘটল। কিন্তু দিয়াগিলভের শিষ্যরা তা করতে দিলেন না। ইউরোপে ছোট ছোট অনেকগুলি সম্প্রদায় এই ঐতিহ্যকে অনুসরণ করতে লাগল।

আর লণ্ডনে নিনেত দি ভ্যালয় নিজস্ব স্কুল প্রতিষ্ঠা করে এই ঐতিহ্যকে ধরে রাখলেন। স্যাডলার ওয়েলশ থিয়েটরে তাঁরা প্রদর্শনী দেখাতে লাগলেন। পরবর্তীকালে এই দলে এলিসিয়া মারকোভা ও এ্যাণ্টন ডলইন যোগ দেন। রোজবেরি এভিনিউয়ের থিয়েটরে এঁদের প্রদর্শনী দেখবার জন্য দর্শকদের ভিড় ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে আর দি ভ্যালয়ের নাম ক্রমে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যখন সমস্ত বিদেশী নৃত্য সম্প্রদায়গুলি লণ্ডন পরিত্যাগ করল তখন স্যাডলার ওয়েলশ ব্যালে লণ্ডনের অভিজাত পাড়া ওয়েষ্টএণ্ডে এসে নাচ দেখাতে সুরু করল। বলাবাহুল্য যে এই সম্প্রদায় লণ্ডনবাসীকে যেমন বিস্মিত তেমনি আনন্দিত করল। তাঁরা জানতেনই না যে তাঁদের দেশেই এমন একটি ভাল নৃত্য সম্প্রদায় আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর লণ্ডনের অনেকগুলি হলে (যেমন কোভেণ্ট গার্ডেন) ইংলিশ ব্যালে নাচের প্রায় প্রত্যহ প্রদর্শনী সুরু হল। ক্রমে ক্রমে স্যাডলার ওয়েলশ ব্যালে ইউরোপ তথা আমেরিকায় প্রদর্শনী দেখাতে সুরু করে এবং এমন এক আলোড়নের সৃষ্টি করে যার সঙ্গে তুলনা করা চলে দিয়াগিলভ সম্প্রদায়ের আলোড়ন সৃষ্টির কথা। আমার মনে আছে ১৯৫১ সালে স্যাডলার ওয়েলশ ব্যালে যখন নিউইয়র্কে প্রদর্শনী দেখাতে যান তখন প্রায় ছয় মাস আগে থেকেই সমস্ত টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। লোকে টেলিগ্রাম মণিঅর্ডারে আগাম টাকা দিয়ে টিকিট কিনেছিল। অতিকষ্টে শেষ পর্য্যন্ত কেবলমাত্র "কোপেলিয়া"র টিকিট যোগাড় করতে পেরেছিলাম। পরবর্তীকালে লণ্ডনে এসে তবে আমার প্রার্থনীয় "সোয়ান

লেক" দেখবার সুযোগ হয়েছিল। এই দলের মারগটফন্টেন, মাইকেল সোমস, ময়রা শিয়ারার, বেরিল গ্রে প্রভৃতি ইংলণ্ডের নৃত্যশিল্পীরা দেখালেন ক্ল্যাসিক্যাল, রোম্যান্টিক এবং আধুনিক তিনরকম ব্যালের ঐতিহ্যই তাঁরা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

এখনো পর্যন্ত নৃত্যকে অমর করে রাখবার কোন উপায়ই উদ্ভাবিত হয় নি। সিনেমার ছবিতে অবশ্য কিছু কিছু স্মরণীয় করে রাখা যায় কিন্তু তাও যথেষ্ট খরচ সাপেক্ষ। নাচ, বিশেষ করে ব্যালে নাচ তাই বেঁচে আছে নর্ত্তক নর্ত্তকীর স্মৃতির মধ্যে। একজন শিল্পী তাঁর শিল্পকে দান করে যাচ্ছেন নবাগত শিল্পীকে। ব্যালে নাচ তাই এখন পর্যন্ত গুরুমুখী বিদ্যা। অতএব এখন যখন আমরা এলিসিয়া মারকোভাকে "গিজেল" নাচতে দেখি কিংবা ভায়োলেটা এলভিনকে "ওডিল" তখন তারি মধ্যে দেখা যায় পাবলোভা, ডেসত্রি, লেগননিকেই। স্বচ্ছ শুভ্র শাদা হাঁসের পালকের মত পোষাকে যখন ব্যালে নর্ত্তকীরা রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন তখন তারি মধ্যে উঁকি মারে শুভ্রবাসা লবুদেহ তাগলিওনি, যখন দেখি কোন গর্ব্বিতা ব্যালে নর্ত্তকী অতি কঠিন বক্রিশ-ব্যালে-বৃত্ত রচনা করে দর্শকদের স্তম্ভিত করছেন তখন তারি পেছনে এসে দাঁড়ায় ম্যারিনিস্কি-ব্যালে-নর্ত্তকীর দল। ব্যালে নাচের পেছনে রয়েছে এই বহুযুগের অধ্যবসায় ও শতাব্দীর সাধনা—তা স্বয়ম্ভু বস্তু নয়।

এক ছিল কন্যা

(পূর্বানুবৃত্তি)

অরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। নদীর মোহানার কাছে এক চরের ধারে এসে বজরা থেমে গেছে। অন্ধকার ঘন আলকাতরার মত ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। বাতাস দিচ্ছে জোরে। কাশবন দুলছে বাতাসে। শোঁ শোঁ আওয়াজ শোনা যায়। নীরেট অন্ধকারে চাপা পুবদিকে তীর দেখা যায়।

বজরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যেন কি এক আদেশের অপেক্ষায়। বজরার বাইরে আলো দেয়া হয়েছে। ভেতরে আলো দিতে বারণ ছিল কর্ত্তাবাবুর।

জোয়ান মাঝি তিনটে অন্ধকারে তাকিয়ে আছে। মাঝে মাঝে জ্বলছে ওদের চোখগুলো। কর্ত্তাবাবু বসে আছেন ভেতরে অন্ধকারে।

রাধারাণী কর্ত্তাবাবুর পায়ের ওপর গাল রেখে কাঁদছে। আস্তোরে কাঁদছে—কি করেছি আমি। বলো আমি কি করেছি।

কর্ত্তাবাবুর মৃদু হাসির সঙ্গে শোনা যায়—কিছুই করো নি।

ওর নরম দেহটা পা দিয়ে আস্তে একটু ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ান কর্ত্তাবাবু।

—চলো একটু বাইরে যাই।

রাধারাণী কর্ত্তাবাবুর পা দুটো আঁকড়ে ধরে আবার, আমার কি অপরাধ বলবে না?

—না। কঠিন স্বর কর্ত্তাবাবুর। রাধারাণীর হাতটা ধরে টেনে তোলেন। বাইরে নিয়ে আসেন।

মাঝি তিনটে উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম জানায় কর্ত্তাবাবুকে। আসামী হাজির। আগে থেকেই বলা আছে। ওদের ইশারা করেন কর্ত্তাবাবু। জোয়ান লোক তিনটে রাধারাণীর তিনপাশে এসে দাঁড়ায়।

বজরার বাইরের ম্লান আলোয় রাধারাণীর মুখটা দেখা যায়। কর্ত্তাবাবুর দিকে তাকিয়ে আছে। সে দৃষ্টির ভাষা মর্মান্তিক করুণ। কর্ত্তাবাবুর মুখখানা পাথরে কোঁদা যেন।

রাধারাণী মুহূর্ত্তে আর একবার এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে কর্ত্তাবাবুর পায়ের ওপর।

স্বর ভেঙে গেছে ওর, তবু প্রাণপণে চীৎকার করে বলে, মারতে হয়, তুমি নিজে হাতে মারো। ওদের হাতে দিও না।

কর্ত্তাবাবু পা দুটোর ওপর থেকে ওকে তুলে নেন হাতে। ফিস্ ফিস্ করে বলেন, নিজের হাত দুটো আর নষ্ট করতে চাই না। ওদের কাছেই যেতে হবে। বজরার ঘরে ঢুকে যান কর্ত্তাবাবু। আর্ত্তনাদ করে আছড়ে পড়ে রাধারাণী।

তারপর বোধহয় আর জ্ঞান ছিল না।

কর্ত্তাবাবুর কাছে কিছুক্ষণ পরে একটা লোক আসে—সব শেষ হুজুর।

কর্তাবাবু গড়গড়া টানেন। কপালে স্পষ্ট কয়েকটা রেখা। বলেন—লাশটা নিকুঞ্জ নাপিতের বাড়ীর সামনে শুইয়ে রেখে চলে আসবে। আমাকে বটগাছের নীচে নামিয়ে দাও। ওখানে ঘোড়া থাকবে। আমি চলে যাব।

বজরা নড়ে ওঠে। অন্ধকার ভেদ করে জলের ওপর বজরা চলে আবার। কর্তাবাবুর কথামতই সব কাজ হয়।

বাইরের ঘরে এসে চুপ করে বসে থাকেন কর্তাবাবু। খানিকক্ষণ সময়ের ভেতরেই কর্তাবাবুর কাছে লোক আসে হাঁপাতে হাঁপাতে—হুজুর রাধারাণী খুন হয়ে পড়ে আছে।

—কোথায় ?

—নাপিতের বাড়ীর সামনে।

—বলো কি ? যেন বিশেষ চিন্তিত হয়ে উঠে পড়েন কর্তাবাবু।

থানায় খবর যায়। কর্তাবাবু নিজে থানায় যান। সব শুনে দারোগা লাশ আনে। নাপিতকে বেঁধে আনা হয়।

নাপিতের কথা শুনে কর্তাবাবুর কথা শুনে দারোগার সন্দেহ হয়।

আশে পাশের লোকের কাছে শুনতে পায়, তারা দেখেছে কর্তাবাবুর সঙ্গেই বেরিয়েছিলো রাধারাণী।

দারোগা হাসে, কেসটা সাজানো মুস্কিল হবে স্যার।

দুহাজার টাকার নোট টেবিলের ওপর রেখে কর্তাবাবু বলেন—নাপিটাকে লটকাতেই হবে।

—টাকা নিতেই এসেছিলো মেজজ্যাঠা। বলে তরঙ্গিণী। মেজজ্যাঠা জেঠিকে সব বলছিলো। মৃগনয়নী, পুঁটি, নোতুন বৌ পাথরের মত স্থির হয়ে বসে থাকে।

তরঙ্গিণী আবার বলে—আহা রে রাধারাণীর লাশটা একবার দেখলে হোত !

ওরা কেউ উত্তর দেয় না।

পুঁটি আর এক গেলাস জল খায়।

পরদিন শোনা যায় নাপিতটাকে চালান দেওয়া হয়েছে সদরে খুনের অপরাধে। মামলায় কর্তাবাবুকেও সদরে যেতে হয় আর তিনহাজার টাকা সঙ্গে নিয়ে।

বাড়ীতে এক গুমট নীরব হওয়া বইতে থাকে। সবাই ফিস্ ফিস্ করে কথা বলে, কাজ করে, খায়, ঘুমোয়। কর্তামা বেশীর ভাগ সময়টাই কাটান ঠাকুর ঘরে।

প্রায় সতেরো দিন পরে কর্তাবাবু ফিরে আসেন। আরও কিছুদিন পরে খবর পাওয়া যায়। খুনের অপরাধে নাপিতের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়ে গেছে। সাক্ষাৎ প্রমাণের গুরুত্ব নেই বলে ফাঁসীটা হয়নি।

আরও একবার স্তম্ভিত হয়ে যায় সমস্ত বাড়ীখানা। আরও একটা নিরীহ মানুষের জীবন গেল। কেউ কিছু বলে না। কর্তাবাবু আরও গম্ভীর হয়ে উঠেছেন, কথা বলেন আরও কম, রাগ দেখা যায় আরও বেশী।

তাই তটস্থ থাকে সবাই। রামতারণ বসে বসে দিনরাত জপ করে। কারো সঙ্গে একটা কথাও বলে না।

তিন

বহুদিন ধরে একটা বিরাট স্বপ্ন মৃগনয়নীর মনকে ভীত করে তুলতো, বিভ্রান্ত করে তুলতো। সংসারে এত অন্যায়ের কি কোন শাস্তি নেই ? সেই তামস মনোবিকারের পরিণতিতে রাধারাণী আকাশে বাতাসে যে আর্তনাদ তুলেছিলো, সে সকরুণ আর্তনাদের কি কোনও মূল্য নেই ?

অনেক বছর পরে মৃগময়নী হাসত আর বলত,—চোখে দেখেছি বাবা, সংসারে অন্যায় করে পার পাবার উপায় নেই। যে মন তামস মোহে ডুব দিয়ে তোমাকে অন্যায় করাবে, সেই মনই একদিন বিচারক হয়ে উঠবে। পাপপুণ্য তো মনে বাবা, মনই চুলচেরা বিচার করে নিজের অন্যায়ের ওপর নিজে শোধ নিয়ে নেয়।

কর্তাবাবুর মৃত্যুর আগের নিজের কথাটা রাধারাণীর আর্তনাদের মতই ওর মনে আছে। বহুদিন আগে ঘরের তাকের ওপর একটা পুরোনো হাঁড়ি থেকে তেঁতুল চুরি করে খেতে গিয়ে বিছের কামড় খেয়েছিল মৃগনয়নী। বিছের কামড়ের জ্বালাটা বেশ মনে আছে।

তার সঙ্গে একমাত্র তুলনা করতে পারে ও কর্তাবাবুর শেষের কয়েকটা দিন।

মনের পরতে পরতে গোটা চল্লিশ বিয়াল্লিশ বিছে কামড়ালে যে রকম জ্বালা হতে পারে, সেটা অনুমান করা কিছুমাত্র কঠিন হয়নি কর্তাবাবুকে দেখে।

মাঝে মাঝে রাধারাণীর নামটাও শোনা গেছে তার মুখে—বিকারের জ্বালায়।

বহুকাল ধরে বহুমৃত্যু দেখেছে মৃগনয়নী, কিন্তু অমন করুণ জ্বালাময় মৃত্যু আর দুটো দেখেনি। রাধারাণীর অসহায় আর্তনাদের বিচার দেখেছে ও।

রাধারাণীর মৃত্যুর পর নাপিতের সাজা, তারপর কর্তাবাবুর অবস্থাটা বেশ মনে আছে মৃগনয়নীর। মাঝে মাঝে উন্মনা হয়ে কি ভাবতেন বসে বসে।

এঁটো হাতেই হয়ত বসে আছেন। কর্তামা আর সামনে বসে খাওয়ান না। মৃগনয়নী তরঙ্গিণী ওরাই কেউ থাকে।

এঁটো হাতে অনেকক্ষণ বসে থাকার পর একটা নিঃশ্বাস ফেলেন, বলেন হয়তো মৃগনয়নীকে, —তোর কর্তামাকে একবার ডাক দিকি ?

মৃগনয়নী যেতো কর্তামার কাছে। জানাই আছে কর্তামাকে পাওয়া যাবে পুজোর ঘরে।

—কর্তাবাবু ডাকছেন।

—কে ? যেন চমকে ওঠেন কর্তামা। বসেছিলেন গোবিন্দজীর সামনে।

—কর্তাবাবু ডাকছেন।—আবার বলতে হয় মৃগনয়নীকে।

কর্তামার ভ্রূদুটি কুঁচকে ওঠে। ফরসা মুখখানি কালো হয়ে ওঠে বোধহয় ভেতরের কোন অসহ্য জ্বালায়। বলেন—বল এখন যেতে পারব না।

—তোমার জন্যে অনেকক্ষণ বসে আছেন।

কর্তামা গম্ভীরস্বরে বলেন,—বিরক্ত করিসনি আমায়। যা বললুম বলগে যা।

মৃগনয়নীকে ফিরে আসতে হয়।

কর্তাবাবুর কাছে ও একথা কি করে বলবে। যদি রেগে ওঠেন?

ও যেতেই কর্তাবাবু বলেন—কিরে এলো?

মৃগনয়নী খুব মিষ্টি করে বলে—গোবিন্দর ভোগ সামনে, বললে আসতে পারবে না এখন। মানে যদি ভোগ নষ্ট হয়!

কর্তাবাবুর মস্ত চাকার মত গোল মুখখানা মুহূর্তে ম্লান হয়ে যায়। উঠে পড়েন, একটুও রাগ করেননা।

কর্তাবাবুর জন্যে কেমন একটু মায়াও হয় যেন মৃগনয়নীর।

ওরা নীরব বিস্ময়ে দেখে কর্তামা কর্তাবাবুর সঙ্গে আর একটা কথাও বলেন না। বেশীর ভাগ সময় কাটান ঠাকুর ঘরে।

রাত্রে অবশ্য শোবার ঘরে যান। কর্তাবাবু যখন ঘুমিয়ে পড়েন, জেগে জেগে অপেক্ষা করে অধৈর্য্য হয়ে পড়েন,—তখন যান কর্তামা। রাত থাকতে ভোরে উঠে বেরিয়ে আসেন।

তরঙ্গিণী হাসতে হাসতে বলে,—লোকে বলে বউকে ত্যাগ করে, এ যে দেখছি কর্তামা কর্তাবাবুকে ত্যাগ করেছেন।

নোতুন বউ বলে,— আহা, অমন করে বোল না, হেসো না, দুজনকে দেখলে বড় কষ্ট হয়।

তরঙ্গিনী খিল খিল করে হাসে,—তোমার তো পুতুলের বিয়ের কনে বাপের বাড়ী গেলেও চোখে জল আসে। নিজের কথা ভেবে ভয় হয় বুঝি?

—ধুস্! কি যে বলো?

পুঁটি এক গেলাস জল খেয়ে এই ধরণের আলাপ হতে দেখে সরে পড়ে। ও কখনও এ ধরণের আলাপে মজে না।

মৃগনয়নী দাঁড়িয়ে থাকে বোবার মত। কথা না বললেও শুনতে ওর মন্দ লাগে না।

এর কথাটা ভাবলেই আজকাল বুকের ভেতর কেমন একটা চমক লাগে। একে নাকি পুলক বলে। বর—কথাটা এত মিষ্টি এতদিন কেন যে বুঝতে পারেনি। দিদির মুখে রসাল কথা শুনলে আরও কেমন কেমন করে। খুসী খুসী লাগে।

পুঁটিকে ও জিজ্ঞেস করে,—দিদি কথা বললে তুই চলে যাস কেন?

হোগা ফ্যাকাসে পুঁটি ফ্যাল ফ্যাল করে বললো—কি জানি ভাই, আমার কেমন ভয় করে।

—ভয়? সেকি রে? বরের কথা শুনলে ভয়!—মৃগনয়নী হাসে।

—হ্যাঁ।—পুরুষ মানুষ ভাবলেই আমার কেমন ভয় লাগে।

—তবে বিয়ে হলে কি করবি?

—বিয়ে না হলেই ভাল ভাই।—ভয়ে ভয়ে বলে পুঁটি।

—দূর! তা কখনও হয়। বিয়ে তো হবেই।

—আমার ওসব ভাবতে ভাল লাগে না।

মৃগনয়নী বলে,—ভাল লাগে না বললে তো তোমায় ছাড়বে না।

পুঁটি ভীষণ চিন্তিত ভীত হয়ে পড়ে, বলে,—ও সব কথা থাক।

মৃগনয়নী বলে,—দেখব সত্যি সত্যি বর এলে কেমন ভয় থাও।

—দেখিস আমি পালাব। ওগুলো মতন পুরুষ মানুষের কথা ভাবতেই আমার কেমন যেন বুক ধড়ফড় করে। থাকগে ওসব কথা, চ' দয়াময়ী মন্দিরে যাই। আজ কালীকেত্তন হবে।

—কে গাইবে?

—বোধহয় ওই নোতুন মাষ্টার।

—চ' যাই।

তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। মৃগনয়নী মাকে বলে দয়াময়ী কালীবাড়ীর দিকে এগোয়। পুঁটি সঙ্গে আছে।

বাড়ীর ভেতর দিয়ে অনেক উঠোন চাতাল পেরিয়ে মন্দিরে যেতে হয়। ওরা বাড়ীর ভেতর দিয়ে চলতে থাকে। সদরের পথ দিয়ে মেয়েরা যায় না।

ছোট শরীকদের আঙিনা পেরিয়ে তবে দয়াময়ী কালীবাড়ীর ভেতরে বাঁ পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। সামনে নাটমন্দিরে গান হবে। আরতি হচ্ছে। গানের একটু দেরী আছে।

পুঁটি আর মৃগনয়নী দাঁড়িয়ে থাকে একটা থামের আড়ালে।

সকলেই হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। এক মনে দেখছে আরতি।

মৃগনয়নীর গরম লাগছে। গায়ে গতরে ও একটু ভারী। কেমন হাঁসফাস করছে। মৃগনয়নী এ পাশে ও পাশে তাকায়। মন্দিরের পুব দিকের চাতালে এসে দাঁড়ায়।

সামনে ছোট একটু মাঠ। অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে ক্রমে। মেঘভরা আকাশে একটুকরো জলে ভেজা চাঁদ—নরম ক্ষীণ আলোর রেখা। মৃগনয়নী বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয়। আরতির বাজনা মাঠের কিনারায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। হঠাৎ মৃগনয়নীর চোখ পড়ে অল্প দূরে কাঞ্চন ফুলের গাছের দিকে। গাছের নীচে দুটি মানুষ দেখা যাচ্ছে। বুকটা কাঁপে ওর। ভূত নয় তো?

ভাবে পালাবে নাকি? পা দুটো সিমেন্টের চাতালে আটকে আছে। একটুও নড়তে পারে না। ভয়ে আবিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

একটু সময় পরে দেখতে পায় একটি মূর্ত্তি ধীরে এগোচ্ছে। ওর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। চীৎকার করবে কিনা ভাবে।

মূর্ত্তিটি পাশ দিয়ে মন্দিরের সদরের পথের দিকে চলে যায়। মানুষটা চেনা মনে হয়। ভাল করে তাকিয়ে দেখে এ সেই নোতুন মাষ্টার। মাষ্টার কি করছিলো কাঞ্চন ফুলের গাছের নীচে!

আর একটি ছায়ামূর্ত্তি এগিয়ে আসে। এবার আর অতটা ভয় পায়না মৃগনয়নী। ভাল করে তাকায়। ওমা! এ যে দিদি! তরঙ্গিনী হন্‌হন্ করে আসে ওর পাশে।

ওকে দেখে তরঙ্গিণীও চমকে ওঠে।—কে ?

—আমি।—কোনমতে বলতে পারে মৃগনয়নী।

তরঙ্গিণী সামনে এসে ওর হাত ধরে বলে,—তুই এখানে কি করছিস ?

—কিছু নয়। এই গরম লাগছিল তাই দাঁড়িয়ে ছিলুম।

—পুঁটি কই ?

—ভেতরে।

তরঙ্গিণী সন্দিগ্ধ চিত্তে বলে,—কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলি ?

—অনেকক্ষণ।

তরঙ্গিনী হঠাৎ হেসে বলে,—কাঞ্চনগাছের নীচে ভাই একটা লোককে দেখে ভয় পেলুম।

—তাই নাকি ?—মৃগনয়নী যেন কিছু জানে না।

—কেন তুই লোকটাকে দেখিসনি ?

—দেখলুম ত একটা লোক গেল !

—দেখিছিস ?—একটা ঢোঁক গিলে বলে তরঙ্গিণী।

—তোমাকেও দেখলুম গাছতলায়।

তরঙ্গিণী চোখ দুটো বড় বড় করে,—ওমা সে কিরে, গাছ তলায় আবার ছিলুম কখন। হন্‌হন্ করে বেরিয়ে এলুম।

—ওই মাষ্টারের সঙ্গে তো কথা বলছিলে ?

—ওরে বাস্! কি মিথ্যুক রে বাবা!

মৃগনয়নী নিতান্ত তাচ্ছিল্য ভরে কথা বলছিল, তরঙ্গিণীর এক গুরুতর অপরাধ ও জেনে ফেলেছে। এরার ওর রাগ হয়।—মিথ্যুক বোল না বলছি, কর্ত্তামাকে বলে দোব সব।

তরঙ্গিণীও চোখ পাকায়,—কি আবার বলবি শুনি ? কি করিছি যে তুই বলবি ?

মৃগনয়নী রেগে চলে যায় কালীবাড়ী ছেড়ে।

তরঙ্গিণী ডাকে পেছন পেছন,—এই শোন্! লক্ষী বোনটি শোন।

মৃগনয়নী শুনবে না। ও শুধু যে রেগে গেছে তা নয়। রাগের চুতো করে ও যা দেখেছে সেটা সবাইকে জানাতে চায়। ও সোজা দৌড়ে চলে যায় কর্ত্তামার ঘরে।

কর্ত্তামা জপ সেরে উঠে এ বেলার রান্নার ব্যবস্থাটা করে দিচ্ছিলেন। ঠাকুর চারজন দাঁড়িয়েছিল সামনে।

মৃগনয়নী ছুটতে ছুটতে ঘরে আসে,—ওরে বাবা!

—কি হোল রে ?—কর্ত্তামা ওকে সস্নেহে ওকে কাছে টেনে নেয়।

—ও মাগো! গেছি!—মৃগনয়নী যেন খুব ভয় পেয়েছে।

—কি হোল ?

ঠাকুরদের দিকে তাকিয়ে কর্ত্তামা বলেন,—সরপুঁটি সরষে বাটা দিয়ে ঝাল কোর, ডালটা পাতলা করে করবে। বাচ্চারা ঘন ডাল খেতে পারে না

ঠাকুররা চলে যায়।

মৃগনয়নী কর্ত্তামার আঁচল ধরে বলে,—ভয়ে মরি কর্ত্তামা! দয়াময়ী বাড়ী কাঞ্চন গাছের তলায়—

—কিরে ? কিছু অপদেবতা টেবতা !

—তাই ভেবেছিলুম, তারপর দেখি ইস্কুলের সেই নোতুন মাষ্টার, ওই যে গান গায়।

—তোর কাছে এসে কিছু বলেছে ?

—না, ওই মাষ্টার দিদির সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফিস্‌ফিস্ করছিলো !

কর্ত্তামা গম্ভীর হয়ে যান।

বয়েসটা মৃগনয়নীর কম নয় খুব। তার মুখে এ ধরণের কথাকে প্রশ্রয় দিতে চান না তিনি। একটু সময় চুপ করে বসে থেকে বলেন,—তুই যা, হৃদয়কে একবার পাঠিয়ে দে।

মৃগনয়নী বেরিয়ে আসে। হৃদয়দা ছিল গোয়াল ঘরে। ও হৃদয়দাকে বলে,—কর্ত্তামা তোমাকে ডাকছে।

হৃদয়দা গরুর জাব্‌না দিতে দিতে বলে,—এখন যেতে পারব না।

—বারে, এক্ষুণি ডাকছে তোমায়।

—যাও এখন। খিঁকিয়ে ওঠে হৃদয়দা।

ও এমন সবাইকে খিচ্‌খিচ্ করে ওঠে। কর্ত্তামাকেও সময় সময়।

কেউ কিছু বলে না। সবাই জানে যে ওর মত বিশ্বাসী আর কর্মঠ খানসামা আর দুটো নেই এ বাড়ীতে।

মৃগনয়নী চলে যায়।

হৃদয় হাতটা ধুয়ে গজ্ গজ্ করতে করতে কর্ত্তামার ঘরের দিকেই এগোয়।

আড়াল থেকে দেখে মৃগনয়নী মুচকী হেসে চলে যায়।

হৃদয় আসতে কর্ত্তামা গম্ভীর মুখে বলেন,—একবার ঘটক বাড়ী যাও, এক্ষুণি। বলবে কাল সকালেই আমি ডেকেছি। আর শোন, কর্ত্তাকে একবার বলে যেও ভেতরে আসতে।

কর্ত্তামার মুখের থম্‌থমে ভাব দেখে হৃদয় আর কথা বলে না। চলে যায়।

(ক্রমশঃ)

পুরশ্চরণ

(পূর্বানুবৃত্তি)

মদন বন্দ্যোপাধ্যায়

মেয়েদের মন একটু বেশি করেই ভেবে নেয়। সত্যজিৎ-উত্তমা সম্বন্ধে অনেক কিছুই ভেবে নিয়েছিল শান্তি। তাই অন্য কাজ-কর্ম করলেও শান্তি অন্যমনা। বাড়ীতে সত্যজিৎ থাকলে সারাক্ষণ তার কাছে থেকে নানানভাবে পরখ করে মনটা—সত্যি সত্যি মজেছে কিনা। শান্তিকে একটু ভালভাবে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে শান্তির পরিবর্তন হয়েছে।

আর সত্যজিৎ চলেছে সব কিছুই ছুঁয়ে। চরণদাসকে ছাড়েনি, রাজনীতির ছাত্র হিসাবে সংযোগ অক্ষুণ্ণ আছে, কলেজ ছুটির পর উত্তমার সঙ্গে অনেকখানি পথ চলে টুকরো কথাবার্তা, তবু মন খুলে কিছু বলতেও পারে না। দিশারীর সঙ্গে সাহিত্য আলোচনাও চলে, আর এদিকে শান্তির সঙ্গে সেই মান অভিমান। সব কিছুতে যেন সামাল দিতে পারছে না সত্যজিৎ। কিছু ছাড়লে কিছু ধরলে যেন ভাল হয়, কিন্তু হয়ে ওঠে না। তাই শান্তির দেওয়া সেই ভীতু আখ্যাটাই স্বীকার করে নিয়েছে সত্যজিৎ। ওর মনে অতৃপ্তির জ্বালা, বিদ্রোহের ফুলিঙ্গ—কিন্তু প্রকাশে আসে কুণ্ঠা, আসে ভয়। তাই আত্মগোপন করেই সত্যজিতের দিন যায়।

সে জন্যেই বোধহয় সত্যজিৎ মুখুজ্যে বাড়ীর মানুষ হয়েও উত্তর কলকাতার অনেক পুরোনো, বিশেষ একটি গলির মানুষদের জীবনধারা থেকে স্বতন্ত্র। বাড়ীর খোঁজ আজকাল রাখে না। পাড়ার টুকিটাকি খবরাখবরও রাখে না—মেজাজী আড্ডা তো দূরের কথা। সীমবদ্ধ মন অসীমের স্পর্শ খোঁজে, কিন্তু স্পর্শের আভাসেই আসে ভয়—ব্যাপ্তি হয় না।

বাড়ীতে সন্ধ্যেবেলার জমজমাট আসর ভাঙা আসরে পরিণত হয়েছে। অনেককাল ওখান থেকে অনুপস্থিত ও। সময় এগিয়ে চলেছে। সত্যজিতের মনে কিন্তু দাগ কাটে না। স্থিতি-অস্থিতিতে, স্থির-অস্থিরে, ঘরে বাইরে নতুন ঘটনা ঘটাচ্ছে, হাসছে, কাঁদছে, আনন্দে আত্মহারা হচ্ছে, দুঃখে বেদনায় কাঁপছে।

কিন্তু সত্যজিতের এতটুকু কৌতূহল নেই এ সবের প্রতি। শুধু উত্তমা আর শান্তি—এ দুটি মানুষকে ঘিরে তার মন জাবর কেটে চলেছে। প্রকাশে আসে দ্বিধা, ভয়। তাই ঘটনা ঘটলেও সে থাকে ঘটনার বাইরে।

তবু মুখুজ্যে বাড়ীতে একটা নতুন ঘটনা ঘটতে সত্যজিৎকে স্পর্শ করল। একটা ঘড়ঘড়ে ক্যাঁচক্যাঁচে শব্দ প্রথম যেদিন শুনল সেদিন ছাদ থেকে নেমে এল সত্যজিৎ। ঠাকুমাকে জিজ্ঞেস করল—এই বিদকুটে আওয়াজ কিসের ঠাকুমা?

ভুবনমোহিনী বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন—কি জানি বাপু। আমার বাপের জন্মে এমন শুনিনি। গেরস্থের বাড়ীতে কল চলছে। কি অনাছিষ্টি।

—কিসের কল?

—পয়সার কল। তোর কাকাকে জিজ্ঞেস করগে যা। আমাকে বাজে বকাসনে। মুখ বিকৃত করে ভুবনমোহিনী নিজের কাজে চলে গেলেন।

সত্যজিৎ এগিয়ে গেল বাইরের ঘরের দিকে। প্রথম দেখেই খানিকটা অবাক হল সত্যজিৎ, কিন্তু পরক্ষণেই বিরক্ত হয়ে উঠল ও।

—এই যে সতুবাবুর টিকিটি দেখা যায় না। থাকিস কোথায়? শিবনাথ বেশ খোস মেজাজে বললে সত্যজিৎকে। ওপাশের ঘরটাও লক্ষ্য করল সত্যজিৎ। ওখানেও চলেছে একটা মেসিন।

—কী হচ্ছে?

—ববিন রে ববিন।

—কী হবে?

খানিকটা হেসে শিবনাথ বললে—অর্ডার আসবে আর সাপ্লাই যাবে। বুঝলি কিছু? না, তোরা মানে আমাদের নেক্স্ট ব্যাচ সত্যিই বড্ড ব্যাকে, মানে পেছনে পড়ে আছিস। খালি চেঁচাতে পারিস, কাজে ফক্কা।

—এই যে শিবে গল্প রাখ, শোন। আমি দোকানে চললুম। কাজগুলো ঠিকঠাক করিয়ে রাখিস। ফাঁকি দেয় না যেন। চলি।

—ভাবিস নে। ঠিক হবে'খন, তুই যা।

সত্যজিতের অবাক লাগছিল দাদাকে দেখে। দাদা অদ্ভুত পাল্টে গেছে। চকচকে, ফিটফাট, চৌখস—ঠিক যেন কলেজের সেই হেংলা চালু ছেলেটার মত। দাদার চলনেও বেশ একটা মেজাজীভাব লক্ষ্য করল সত্যজিৎ।

—তুই বুঝি খুব অবাক হয়েছিস? কিছুই খোঁজ রাখবিনে তোরা! জানিস, জাপান যুদ্ধে নেমেছে।

—তাই নাকি? কাগজ কদিন পড়ে না সত্যজিৎ। তবে কলেজে হৈ হৈ শুনেছিল। হঠাৎ তার মনে হচ্ছে সে যেন এ পৃথিবীতে ছিল না। এ বাড়ীতে থেকেও এত বড় একটা পরিবর্তন—বাইরের ঘর দুটো কারখানা বনে গেল, এ যে বিশ্বাস হয় না। এই সেদিন, কবিগুরুর মৃত্যুর দিন দিশারী-উত্তমা সে নিজে কত কথা বলেছে। আর এরই মধ্যে এত পরিবর্তন। না অনেক সময় চলে গেছে। লজ্জিত হল সত্যজিৎ। আই, এ পরীক্ষাও তো হয়ে গেছে। তবে হ্যাঁ, বাড়ী থাকে কতটুকু। বেশীর ভাগ সময় কেটেছে দিশারীর কাছে, উত্তমাদের বাড়ীতে—যদিও উত্তমা নেই, পরীক্ষা দিয়েই মামার সঙ্গে দার্জিলিং চলে গেছে। ফিরবে পরীক্ষার খবর বেরুলে। ঘুমোচ্ছিল না কি সে? অদ্ভুত লাগে নিজেকে। না, সত্যিই বড্ড অন্যায়। সত্যজিৎ মাথাটা নাড়া দেয়।

ব্যাপারটা আচমকাই হয়ে গেছে। মুখুজ্যে বাড়ীর কর্তা দীননাথও আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন ছোটভাই বিপিনের প্রস্তাব শুনে। কীর্তনের আসরে হঠাৎ একদিন এল বিপিন। অনেককাল বাদে। দোকান করার পর থেকে বিপিন ঠিক আগের মত সান্ধ্য আসরে আসে না। বলে, সময়

করতে পারি না। সেদিন কিন্তু আসর বসার আগেই বিপিন হরিহরকে সঙ্গে নিয়ে হাজির। দীননাথ সবে ফিরেছেন। শ্যামভাই আসেননি। গোপীনাথরাও কেউ তখনও হাজির হয়নি। শান্তিকে বলে বিপিন কম্বল পাতল, তারপর শান্তিকে জিজ্ঞেস করল—হ্যাঁ রে দাদা এসেছে?

—এই যে হরিহর, ব্যাপার কী, অনেকদিন দেখিনে কেন? স্মিত হাসির সঙ্গে কথাগুলি বলতে বলতে ঘরে এলেন দীননাথ।

একটু বিব্রত হল হরিহর, হাতটা কচ্‌লে দীননাথের দিকে একবার চেয়ে একটু হাসির রেশ টেনে বললে—মানে ঠিক সময় করে উঠতে পারি নে দাদা, তাই মানে ঠিক আসাটা হয়ে ওঠে না।

দীননাথ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন, তারপর মৃদু হেসে বললেন—দিনকাল যা পড়েছে, তাতে তো দেখি সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠছে আস্তে আস্তে। তারপর শান্তির দিকে ফিরে বললেন—কি মা, চাটা খাওয়াবিনি আমাদের।

—এই যে আনছি। ঠাকুমা জল চাপিয়েছে। এই বলে শান্তি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এরপর কিছুক্ষণ চুপচাপ। বিপিন উসখুস করছে অথচ কথাটা পাড়তে ঠিক যেন ভরসা পাচ্ছে না।

দীননাথ বুঝতে পারেন এরা কিছু বলতে চায়, তাই তিনি হরিহরের দিকে চেয়ে বললেন—কিছু বলবে নাকি হরিহর?

—মানে বিপিন বলছিল, একটা কারখানা করতে চায়। সেই সম্বন্ধে একটু পরামর্শ।

দীননাথ হাসলেন—ব্যবসার পরামর্শ! কিন্তু আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও ব্যাপারে।

বিপিন এবার মুখ খুললে—আমি আর হরিহর দুজনে মিলে একটা বর্ষন তৈরির ছোট কারখানা করব ঠিক করেছি। সস্তায় পুরনো মেসিনও পেয়েছি। কিন্তু বিপদ হয়েছে জায়গা পাওয়া মুস্কিল, তাই আমাদের বাইরের ঘর দুটো তো অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে সেখানে—

—বাড়ীতে!

তাছাড়া তো কোন উপায় দেখছি না। আর পুঁজিও তো কম, সেদিক থেকে দেখলে—

দীননাথ একবার ছোট ভাইয়ের মুখের দিকে চাইলেন। জীবনের অনেকগুলো বছর পার হয়ে এসেছেন ছোটভাইকে পাশে নিয়ে, কিন্তু কোনদিন ওর কোন কাজে না বলেননি। আজও বললেন না।

কিছুক্ষণ পরে বিপিন হরিহরের দিকে চেয়ে বলেন—আমি তাহলে একবার দোকানের দিকে যাই। সরো একা রয়েছ অনেকক্ষণ। তুই তাহলে বোস।

—আমি, মানে, ওখানে একবার গেলে হত না। মগনলাল বলছিল কাল সকালে সে থাকবে না।

—ও হ্যাঁ, তাহলে চ।

—আজ উঠি দাদা। কাসার চেষ্টা করল হরিহর।

—এস। দীননাথ চাইলেন বেশ প্রশান্ত মুখে।

ওরা চলে গেল। দীননাথ চুপচাপ বসে রইলেন। কী যেন ভাবছেন তিনি। বিপিনকে কী? না, বিপিনকে নয়, হরিহরকে নয়—ভাবছেন ব্যস্ততা কী দুর্বলতারই লক্ষণ। হয়ত তাই। মানুষ দুর্বল বলেই এত ব্যস্ত। ধীরস্থির যে, সে তো অনেক মুক্ত।

—একি! ওরা চলে গেছে জ্যেঠু?

—হ্যাঁ মা, ওরা চলে গেছে। বড্ড ব্যস্ত ওরা। হাসলেন দীননাথ।

—এই নাও তোমার চা। বাকী দুকাপ নিয়ে কী করি বল তো?

—তুই খা না এক কাপ। হাত বাড়িয়ে এক কাপ চা নিয়ে বললেন দীননাথ।

—বারে, আমি বুঝি চা খাই এসময়ে! দেখি সতু ফিরছে কিনা।

—তা দেখ গে, কিন্তু একটি কাপ রেখে।

শান্তি চোখ ফেরাল। দরজায় দাঁড়িয়ে মিষ্টি মিষ্টি হাসছে শ্যামভাই।

—কার জিনিষ কে খায়! নাও ঠাকুর ধর, এখন দেখি আর এক কাপের কি গতি করি। বলে আর দাঁড়াল না শান্তি। ছাদের সিঁড়িতে ধীর পাদক্ষেপে উঠে চলল।

শান্তি চলে গেলে দীননাথ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হেসে শ্যামভাইকে বললেন—বেশ আছ তুমি বন্ধু, দীলারসে সদাই মশগুল।

শ্যামভাই কাপে চুমুক দিয়ে দীননাথের দিকে চাইলেন, কি যেন দেখলেন, তারপর আস্তে করে জিজ্ঞেস করলেন—বড্ড ক্লান্তি লাগছে, না?

দীননাথ ম্লান হাসলেন একটু, তারপর বললেন—এখনও কি সময় হয়নি বন্ধু? এখনো কি পরীক্ষার শেষ হল না? ভিজে গেছে দীননাথের স্বর।

কাপটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে শ্যামভাই আস্তে আস্তে দীননাথের কাছে এগিয়ে এলেন, তারপর কাঁধে একটা হাত রেখে কাঁপা স্বরে বললেন—পরীক্ষা তো শুধু তোমার নয়, পরীক্ষা আমারও বন্ধু। তুমি যেমন বন্ধু, তেমনি তুমি আমারও গুরু। একথা তুমি না জানলেও আমার মন জানে। তাই আমারও প্রতীক্ষা। তোমার নির্দেশ ছাড়া তো আমি চলি না।

হঠাৎ দীননাথ কেমন যেন হয়ে গেলেন। চোখ দিয়ে জলধারা নেমে এল তাঁর। সারা শরীরে আবেগের কলোচ্ছ্বাস। শিরায় শিরায় অমৃতে অণুতে তার রেশ। কাঁপছেন থর থর করে দীননাথ। একি বলছে শ্যাম, সেও রয়েছে তাঁরই নির্দেশের অপেক্ষায়?

—একি সঙ্কট ঠাকুর? একি করলে? পথ বলে দাও ঠাকুর। শিশুর মত ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন মুখুজ্যে বাড়ীর সেই শান্ত গম্ভীর স্বল্পভাষী কর্তা দীননাথ। হঠাৎ জ্ঞানহারা হয়ে এলিয়ে পড়লেন শ্যামভাইয়ের গায়ে। শ্যামভাই চমকে উঠলেন। সারা শরীরে লাগল রোমাঞ্চ। কি করবেন ভেবে পেলেন না, শুধু বিহ্বল চোখে চেয়ে রইলেন দীননাথের মুখের দিকে।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেছে। শ্যামভাইয়ের মন ভাবলোক থেকে ফিরে এল বলাইচাঁদের উৎকণ্ঠিত ডাকে—শ্যামভাই, কি হয়েছে দীনুকাকুর?

শ্যামভাই চাইলেন বলাইচাঁদের দিকে। জল ছলছল চোখ, সারা মুখমণ্ডলে ভাবাবেশ—ঠোঁটের কাঁপনে তার মৃদু ইঙ্গিত। তারপর আবার দীননাথের দিকে চেয়ে রইলেন।

—ডাক্তার ডাকব?

—না তুমি শ্রীখোল নিয়ে বস, নাম সুরু করলেই ওর চেতনা ফিরে আসবে।

বলাই বিস্ময় বিহ্বল চোখে মন্ত্রমুগ্ধের মতই শ্রীখোলের আবরণ খুলতে লাগল। কথা এল না তার।

শ্যামভাই চোখ বুজে খঞ্জনীতে ঝঙ্কার তুলে নাম গান সুরু করলেন। বলাইচাঁদ তারি ছন্দে তালে শ্রীখোলে মৃদু মিষ্টি বোল তোলে।

অনেক সময় মনকে মেলে ধরতে পারলে প্রাণ যেন হাল্‌কা হয়। সেদিন গভীর রাত পর্য্যন্ত, কীর্ত্তন শেষে এপাড়ার দুটি পুরনো মানুষ দুজনকে দুজনের কাছে মেলে ধরলেন অনেক দিন বাদে। জীবনটা তাঁদের একটা বাঁকের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। দীননাথ আর শ্যামভাই বিচ্ছিন্ন হয়েও বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারেননি। তাই দীননাথ বিবাগী শ্যামভাইকে ফিরিয়ে এনেছিলেন অনেক খুঁজে। আর শ্যামভাই পিছনে ফেলে আসা পথ ভুলতে পারেন একটি প্রাণীর জন্য, যার অনুরোধ উপেক্ষা করতে তাঁর গেরুয়া-মনও পারেননি, যার তাগিদে যে ব্যাকুলতা নিয়ে শ্যামভাই গৃহত্যাগ করেছিলেন, হয়ত দীননাথের মধ্যে সেই চাওয়ার একটি দিক খুঁজে পেয়েছিলেন। আবার এই কলকাতা. এই পাড়ায় তারপর দীর্ঘ প্রতীক্ষা। প্রতিটি সন্ধ্যেবেলায় কীর্ত্তনের আসরে বন্ধু দীননাথকে দিনের পর দিন দেখেছেন অনেক কাছ থেকে, স্পর্শ পেয়েছেন এক অদ্ভুত আনন্দের, গায়ে লেগেছে রোমাঞ্চ, মনে মনে করেছেন প্রণাম।

ধীর অকম্প স্বর দীননাথের—এবার আমি সংসার থেকে অবসর নেব। বিপিন এখন সামলাতে পারবে, কি বল শ্যাম।

শ্যামভাই চাইলেন দীননাথের দিকে। শান্ত স্থির মন দীননাথের। মৃদু হেসে বললেন—তা পারবে বইকি।

দীননাথ চোখ বুজলেন, তারপর আবার কোথায় যেন হারিয়ে গেলেন।

শ্যামভাই খঞ্জনীতে মৃদু ঝঙ্কার তুললেন। কণ্ঠে তাঁর আত্মসমর্পণের সুর। বলাইচাঁদ শ্রীখোলে বোল তোলে। ভীরু রোমাঞ্চিত মনে ওর শিহরণ জাগে। গোপীনাথের চোখে বিস্ময় কমে নতুন সুখের ধারায় সেও সিক্ত হয়ে ওঠে।

(প্রথম পর্ব সমাপ্ত)

আলোচনা

বঙ্গ সাহিত্য প্রসঙ্গে

অঘটন আর কাকে বলে!

বাঙ্‌লা ১৩৮৩ সাল। তারও শেষার্ধ। প্রমথ চৌধুরী বিগত হয়েছেন বেশি দিনের কথা নয়। পরশুরাম অর্থাৎ রাজশেখর বসু এখনও বর্তমান। এমন সময় বাংলা সাহিত্যের আসরে এমন এক অভাননীয় অঘটন ঘটবে ভাবা যেন অসম্ভব। কিন্তু ঘটেই যখন গেছে—তখন তাকে তুচ্ছ করা কেন? এদেশে 'হাসির দুর্ভিক্ষ' এসেছে বেশ কিছু কাল। সেই সঙ্গে 'কোন্ রচনাটি যে কোন্ রসের, সে রসবোধটুকুও আমাদের বিলুপ্ত হতে চলেছে'—এ সত্যটুকু যদি সাহিত্য পাঠকেরা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন—তবে আপশোষের সীমা ছাড়িয়ে যায় না কি!

আজকাল না-কি আমাদের আ-মরি! বাংলা ভাষার সকল সৌন্দর্য ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে ভাষা-গঙ্গার দুকূল উপছে পড়ছে। যে স্রোত ক্ষীণধারায় বইত সেই স্রোত মুখর হয়ে খর ধারাই কেবল নয়, বন্যার বন্যবেগে প্রবাহিত হচ্ছে।

বন্য বেগেই বটে। তাতে আর সন্দেহ কি! সন্দেহ করবার কিছু থাকত, যদি ষোল গণ্ডারও বেশি পত্র-পত্রিকা একই ধাঁচে, একই ছাঁচে, একই রূপে ও স্বরূপে 'মুদিখানাবেশে' আত্মপ্রকাশ না করে এই মা-ষষ্ঠীর কৃপার-দেশে মা-সরস্বতীকেও বিব্রত করতে একটু আধটু দ্বিধা করত।

বঙ্গভারতীর সমৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যমত্ততার পরিচায়ক না-কি প্রতিবছরের শারদীয়া সংখ্যাগুলি। এক এক শারদীয়াতে এত এত পত্রিকা ও বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়, যার সঙ্গে একজন পাঠকের একার পক্ষে এক বছরেও পরিচয় সম্ভব নয়। তবুও কোন ধৈর্যশীল পাঠক, অর্থবানও বটে—যদি কখনও দশ-বিশখানি শারদীয়া সংখ্যা শেষ করতে পারেন তখন তাঁর মুখে নির্ঘাৎ শোনা যায়, আধুনিক যন্ত্রযুগে মেসিনের প্রস্তুতিতে যে দ্রব্য সম্ভার—একই প্রকারের হলেও লাখে কোটিতে পয়দা হয়, তার সঙ্গে শারদীয়া সংখ্যাগুলির তেমন কোনো পার্থক্য নেই। এ সম্বন্ধে দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভেও গুরু গম্ভীর আলোচনা হয়েছে। তবুও ফল তেমন না-হওয়াতে কি অনুমান হয় না যে, বাংলা সাহিত্যের বন্যা আর যারই হোক, নতুন নতুন সৃজনশীলতার পরিচায়ক নয়।

বিশেষ শারদীয়া আয়োজন যেমন বঙ্গ সাহিত্যের সমুন্নতির পরিচায়ক নয়, তেমনি সাধারণ আয়োজনের স্বরূপের-কথা খুব যে বেশি উৎসাহব্যঞ্জক, এমন প্রতিশ্রুতিও কেউ দিতে পারবেন বলে মনে হয়না।

কিন্তু থাক সে-কথা। আসল কথায় ফেরা যাক। অঙ্কুরের আগে বীজ। কিন্তু ভালো বীজও কাজে আসেনা—ঠিকমত লালন, পালন যদি না হয়। বঙ্কিম, রবীন্দ্র, শরৎ, প্রমথ প্রমুখ প্রতিভার সাধনায় যে-সাহিত্য পুষ্ট, সে-সাহিত্যের বীজ যে মহত্তর সম্ভাবনায় সুন্দর, সে সম্বন্ধে বাংলা সাহিত্যের শত্রুরও কোনো সন্দেহ নেই। তবে কিনা—ওই বীজের উত্তরাধিকারীরা সে-মহত্তর

সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে কতটা 'নিষ্ঠা' ও আন্তরিকতায় সত্যিকার সাধনা করছেন, তার উপরেই না বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ বহুলাংশে নির্ভরশীল।

কিন্তু বিগত কয়েক বছরের অজস্র গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, আলোচনা, সমালোচনার মধ্যে থেকে আজ যদি একটা দু'টিও মহৎ সৃষ্টি খুঁজে বের করতে হয়, তাহলে যে-কোনো রসজ্ঞ পাঠকের প্রাণপাখী খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম হবে। তাই প্রশ্ন জাগে, সত্যিকারের সাধনা কি সত্যিই হচ্ছে? কেবল সংখ্যাই বাড়ছে! শোনা যায়, আজকাল একই গল্প একবার রেডিওতে, পরে শারদীয়াতে অতঃপর উপন্যাস আকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করে—সরকারের, শারদীয়া-সংখ্যা প্রকাশকের তথা পাঠকের পকেট কাটতেই ব্যস্ত হয়ে উঠছেন বাংলা সাহিত্যের মহারথীরা। যাঁরা এ ত্রুটির শিকার হননি, কিংবা হবার সুযোগ পাননি, তাঁরা ব্রতী আছেন নতুন মহৎ সৃষ্টির সাধনায়, এমন আশার কথাও বলা বাতুলতা আজ। অথচ বাংলা সাহিত্যের রাজ্যে কাগজ ও কালির খরচ একালে কমেছে বলেও মহলানবীশ মশায় আমাদের জানাননি। বরং আগে যেখানে লেখকের সংখ্যা সীমিত ছিল, এখন সেখানে সংখ্যাতীত লেখক-লেখিকাতে বঙ্গ সাহিত্য-জগৎ লেখকাকীর্ণ। এত শত শত লেখক লিখছেন, সে-লেখার বহুলাংশ প্রকাশের পথও পাচ্ছে, পাঠক সেগুলির কিছু কিছু পড়েছেনও যে না, তেমন নয়। তবুও যেমন লেখক তেমনইত তৈরী হচ্ছে তার পাঠক!

পাঠক তৈরী করা মহৎ রচনার একটি বড় রকমের লক্ষণ। ভালো লেখকের লেখা যেমন পাঠক তৈরী করে; তেমনি রসজ্ঞ, জ্ঞানী, সুধী পাঠকও আবার লেখক সৃষ্টিকারী। রচনার মান পাঠকের মানসিক গঠনের মানোন্নত করতে সক্ষম। একটিমাত্র ভালো উপন্যাসের প্রভাবে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ যেমন উচ্চস্তরে উন্নীত হবার প্রয়াসী হয়ে ওঠে বা উঠতে পারে, তেমনি বিশ্রী কুশ্রী রচনার প্ররোচনায় কত লোকই না নীচুস্তরে নামতে সুরু করে। সেই জন্যেই বলা যায়, জাতীয় চরিত্র সৃষ্টিতে মাতৃভাষার অবদান অনন্যসাধারণ। আর যে কথা বলার ছিল; লেখকদের দায়িত্ব পাঠক সৃষ্টি করা, পাঠক তার প্রতিদান দেন লেখকের কাছ থেকে ক্রমাগত মহত্তর সৃষ্টির দাবী পেশ করে এবং লেখককে নীচুস্তরে নামবার স্বাধীনতা না-মঞ্জুর করে।

এই সত্যের অদৃশ্য বন্ধনে যতদিন সাহিত্যিকদের সঙ্গে পাঠকগোষ্ঠীর আত্মিক মিলন অটুট থাকে ততদিন সাহিত্যের রাজ্যে সৃজনশীলতার উন্মুখরতা অসম্ভব মোটেই নয়, যখনই এই মিলন টুটতে থাকে তখনই সৃজনশীলতার ঘটে পরাজয়। ক্রমশঃ পরাজয়ের স্রোত বেয়ে আসে বন্ধ্যাত্ব। লেখকের রচনার সার, ধার, লক্ষ্য, মহত্ত্ব সবই গিয়ে ঠেকে কলম চালানোর গতানুগতিকতায়। সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের একদল, অবশ্যি অতি অল্পসংখ্যক—পুরাতন প্রতিভার আলোকে অন্ধকারে পথ দেখবার প্রয়াসী হয়ে ওঠেন। আর অন্যদল, সংখ্যায় বৃহত্তর—যুগস্রোতে চলেন ভেসে সেই বালুচড়ারই দিকে, যেখানে ঠেকলে জাহাজডুবি অনিবার্য।

ইদানিংকালে যে যাই বলুন না কেন, শক্তিমান লেখকদের বহুল-প্রচারিত-কলম-নিঃসৃত সাহিত্য সমালোচনা, (যা পাঠকদের রুচি ও মনের গতি নিয়ন্ত্রণে বিশেষভাবেই সক্ষম) বাংলা

সাহিত্যের পাঠকদের প্রতি মোটেই সুবিচার করেনি এবং সাহিত্যিকদের স্বার্থরক্ষী ও দরদী হিসাবে পরোক্ষে বাংলা সাহিত্য তথা সাহিত্যিকদেরও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনও দেখা গেছে কোনো খ্যাতনামা সাহিত্যিক নেহাৎ-ই অর্থের তাগাদায় একই প্লট ঢেলে সেজে দুখানি মোটা দামী উপন্যাস বাজারে ছেড়েছেন। কিন্তু শক্তিমান সমালোচক, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে উভয় উপন্যাসের পঞ্চমুখ প্রশংসায় মুখর হয়ে, বহুল প্রচারিত পত্রে সমালোচনার নামে প্রশস্তি পাঠ লিখে লক্ষ লক্ষ পাঠককে বিভ্রান্ত করতে ইতস্তত করেননি (তবু বাংলা সাহিত্যের ভাগ্য ভালো—ওই দু'খানি উপন্যাস কেনবার মত আর্থিক ক্ষমতা বেশি সংখ্যক লোকের না থাকাতেই রক্ষে)। তাছাড়া, সমালোচনার রাজ্যে আজকাল যেমন অরাজকতা তেমনিটি বহুকাল দেখা যায়নি। সেই সঙ্গে বিজ্ঞাপন-বিভ্রান্তি রয়েছে—যেন ঠিক গোদের উপর বিষফোট। যে বই বাজারে বেরোয়, লেখকের সঙ্গে সমালোচকের আঁতাতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, সে বইয়ের সমালোচক বইখানিকে একদম স্বর্গে তুলে দিয়ে বিশ্বের সেরা বলতেও ছাড়েন না (অবশ্যি, ওই বিশ্ব যে তাঁদের ক্ষুদ্র পরিবেশ নিয়ে গড়া, সে সত্যটুকু সম্বন্ধে যেমন সমালোচক তেমনি পাঠক উভয়ই অচেতন। একটুখানি সচেতন যদি কোনো পক্ষ হতেন, তাহলে ঘন ঘন লজ্জা ও প্রতিবাদ প্রকট হত না কি?)।

সে হওয়া দূরে থাক, আত্মপ্রসাদ, শুধু আত্মপ্রসাদই—সম্বল হতে বসেছে। আমাদের মাতৃভাষার সাহিত্যের মত সাহিত্য আর কোথায় আছে, কারই বা আছে। আমাদের ছোটগল্প—সে অতুলনীয়! আমাদের রচনা—সে অনন্য! আর উপন্যাস—(যদিও বলে দেওয়া হয়, উপন্যাস না বলে একে বড় গল্প বলাই সংগত) সে ও-ভি আচ্ছা! বাদবাকী রম্য রচনা, এত চমৎকার যে পাঠকেব জন্য লিখে দিতে হয় বিজ্ঞপ্তি স্বরূপ 'রম্য-রচনা'। তারপর ব্যঙ্গরচনা। যেখানে ঘোষিত নয়, সেখানেই বিভ্রাট! পড়ার পর পাঠক জিজ্ঞেস্ করে বসে, সম্পাদক মহাশয়, এ কেমন করে সম্ভব হতে পারে? এরই উত্তরে সম্পাদক যা মন্তব্য করেন, সেও পাঠকের মনে নতুন প্রশ্নের জাল বুনে যায়। অবশ্যি ব্যঙ্গ-রচনার বিজ্ঞপ্তি না দেওয়াতেই যে বিভ্রাট সে তখনও পরিষ্কার হতে চায় না।

তবে কথা হচ্ছে: সহজে যাতে হাসি আসে আর কাতুকুতু দিয়ে হাসানোতে পার্থক্য অনেক বটে। এবং এ পাঠকের মনে যখন মুছে যেতে বসে, কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যঙ্গ সিরিয়াস্ হয়ে ওঠে অথচ তারস্বরে চীৎকার করে উঠতে হয় "আমাদের মত ষোলকলায় পূর্ণ সারবান সাহিত্য আর কোথায়;—সেকথা অন্য কেউ কেন যে বোঝেনা"—তখনি আশঙ্কা হয়, সাহিত্যে দুর্দিন আসন্নপ্রায়।

অমল ঘোষ

করণিক প্রসঙ্গে

বাঙালী কেরাণীর জাত। হালে নাকি অনেকের কাছে কথাটা ভাল ঠেকছে না। তা, যদি বলি ভদ্রলোকের জাত, তবে নিশ্চয়ই কোন আপত্তি উঠবে না! এবার ভেবে দেখুন, আসলে ভদ্রলোকও যা কেরাণীও তা, কিম্বা কেরাণীও যা ভদ্রলোকও তা-ই। বলুন, ঠিক কি না? তবে আমাদের কেরাণীর জাত বললে আর আর আপত্তি কিসে? বলা নিষ্প্রয়োজন যে আমাদের আলোচ্য বিষয় নাগরিক চৌহদ্দিতেই সীমাবদ্ধ। কেরাণী বলতে আমরা যা বুঝি তা' নাগরিক অর্থেই প্রযুক্ত।

'ভদ্র'সমাজে করণিক প্রাধান্য শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নয়। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, এই করণিক প্রভাব নাগরিক জীবনে ত বটেই সমগ্র বাঙালীজীবনের প্রতিটি স্তরে বিস্তৃত হয়েছে। কেরাণীই বাঙালী জীবনের উচ্চাদর্শ। বাঙালী সমাজধারা আচারব্যবহার শিক্ষাদীক্ষা সবেরই লক্ষ্য খাঁটি কেরাণী গড়া। কেরাণীর বৈশিষ্ট্য কি? ভাল কেরাণী হবার জন্য কোন কোন গুণ অত্যাবশ্যক? কলম-পেষায় বুদ্ধি শুধু অপ্রয়োজনীয়ই না, খাঁটি কেরাণী হবার অন্তরায়ও বটে (আজ্ঞে হ্যাঁ, যে বাঙালী বুদ্ধির দম্ভে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য সেই বাঙালীর প্রধান পেশায় বুদ্ধির কোন স্থান নেই!) প্রয়োজন এমন একটি নমনীয় ক্ষীণস্বাস্থ্য দেহের, যে দেহকে খুব সহজে কুঁজো করা যায়। নিজেকে উপযুক্ত কেরাণীরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এই দেহ-গঠন একান্ত প্রয়োজন, প্রথমতঃ, দশটা থেকে পাঁচটা অবধি এক নাগাড়ে (আধ ঘণ্টাখানেক বিরতি থাকে বটে।) এক টেবিলে মুখ গুঁজে কাজ করার পক্ষে শক্ত, সটান, সুস্থ দেহ একান্তই অনুপযুক্ত (ওই রকম 'চাষাড়ে' চেহারা ভদ্রজনোচিত নয়ও বটে!) দ্বিতীয়ত, সর্বদাই উপরওয়ালাদের সামনে কুঁজো হয়ে থাকতে হয়; এইদিক থেকে সটান দেহ Physically unfit। তাই এই ধরণের বেয়াড়া শরীর যাতে না না গড়ে ওঠে সেই দিকে বাঙালীর ছোটবেলা থেকেই নজর রাখা হয়। দেখুন, বাঙালী মায়েরা ছেলেদের চোখের আড়ালে যেতে দেন না, যে ছেলে যত চুপচাপ, কুনো এবং মায়ের আঁচল ধরা সে তত 'লক্ষ্মী ছেলে'। দৌড়-ঝাঁপ হুটোপুটি করে এমন দুরন্ত অবাধ্য ছেলেদের মায়েদের মুখ দেখান ভার। তাই ভাল করে বসতে না শিখতেই ঘরের এককোণে মাথাগুঁজে বসিয়ে ধারাপাত, নীতিকথা ইত্যাদি মুখস্থ করান হয়। ভবিষ্যতের আদর্শ কেরাণীজীবনের মাথাগুঁজে বসার ট্রেনিং এই ভাবেই সুরু হয়। আবার দৌড় ঝাঁপে শরীর শক্ত সমর্থ হয়ে উঠতে পারে, সে ভয়ও আছে বুঝি।

তারপর আশৈশব সাধনায় যে কেরাণী দেহটি তৈরী করা হয়, তাকে আবার সযত্নে ধাতস্থ রাখতে হয়। তাই কেরাণীর পক্ষে খেলাধুলা, ভ্রমণ কি অন্যকোন উপায়ে মুক্ত হাওয়া সেবন বিষবৎ পরিত্যাজ্য। ভোরে ওঠা নিষেধ; ধোঁয়াটে রান্নাঘরে যদি সম্ভবপর না-ও হয় তবে অন্তত গলির কোন অন্ধকার চায়ের দোকানের কোণে বসে ডিসপেপটিক চা সহযোগে পরচর্চা বাঞ্ছনীয়

(পরচর্চা ইত্যাদি বিভিন্ন করণিক পদ্ধতি যে মানসিক সঙ্কীর্ণতার সৃষ্টিতে সহায়তা করে, তা সম্ভবত দৈহিক পুষ্টিকেও প্রতিরোধ করে, দেহ-মনের এই যোগাযোগ নিয়ে অনেক মনস্তাত্ত্বিক এবং চিকিৎসক ভাবছেন)। বিকেলের আলো দেখার ভয় নেই। 'দশটা পাঁচটা'র সুচিন্তিত সময় বিন্যাসের জন্য বিকেলের আলো কেরাণী জীবনে অদৃশ্য। বাড়ী ফিরে এলেও সেই দেহ সাধনায় শৈথিল্য নেই। যে সব খেলা কুঁজো হয়ে বসে খেলতে হয়, যেমন তাস, পাশা প্রভৃতি, সেই ধরণের খেলাতে বা কিছুটা পরচর্চায় দেহটাকে এবং মনটাকেও কিছুটা ধাতস্থ রেখে বাড়ী ফিরে কিছু গেলা। তারপর…ইত্যাদি।

গেলার প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল, বাঙালী খাদ্যাখাদ্যের ব্যাপারেও অত্যন্ত সাবধানী। খাদ্যে পুষ্টিকারিতাকে সযত্নে পরিহার করা হয়। এমন কি মাছ তরিতরকারী প্রভৃতি খাদ্যেও যাতে প্রোটিন ভিটামিন কিছুমাত্র অবশিষ্ট না থাকে সেজন্য বিশেষভাবে ভেজে নেওয়া হয়। তারপরও যদি বা অবশিষ্ট থাকে,সেজন্যও প্রচুর পরিমাণে মসল্লা ব্যবহার করে খাদ্যকে একেবারে নির্দ্দোষ করে নেওয়া হয়। দুধ-ঘির ব্যাপারে গোয়ালা এবং ব্যবসায়ীরা যথেষ্ট সহযোগিতা করেন, ভেজালে তাদের কার্পণ্য নেই।

এই করণিক শরীর-গঠনে সমাজ ব্যবস্থা এবং আচার ব্যবহারের অবদানই কি কম? বাঙলার গৃহিণী জননাদের কথা ভেবে দেখুন। সকলেই জানেন মায়ের স্বাস্থ্যের উপর সন্তানের স্বাস্থ্য অনেকটা নির্ভরশীল। তাই আমাদের দেশে মেয়েদের শরীর কোনক্রমেই যাতে বেয়াড়া রকমে পুষ্টিলাভ না করে সেদিকে বিশেষ নজর রাখা হয়, যেমন, প্রথমত, ভোর থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত হেঁসেলের আঁচে রেখে তাদের শারিরীক ভারসাম্য বজায় রাখা হয়। শারীরিক ব্যায়াম বা সমার্থক শরীর সঞ্চালন এদেশে অতিশয় নির্লজ্জ ব্যাপার, প্রায় গো-হত্যার মতই কল্পনাতীত। সবাই জানি, আমাদের দেশে মেয়েরা স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখাকে কি রকম গর্হিত বলে মনে করেন, তাদেরও পরচর্চা একমাত্র অবসর বিনোদন, কোঁদল একমাত্র রাজনীতি। মোটকথা এই জননীদের গর্ভে সুস্থ সন্তানের জন্ম, জলে পাথর ভাষার মতই কষ্টকল্পনা সাধ্য।

আদর্শ কেরাণী হবার দৈহিক প্রস্তুতির মত মানসিক প্রস্তুতিতেও ত্রুটি নেই। কায়িক পরিশ্রমের দিকে যাতে কোন রকম ঝোঁক না আসে সেইজন্য সামাজিক আবহাওয়াকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত রাখা হয়। আমাদের দেশের লিখিত-অলিখিত আইনকানুন মানুষের আচার ব্যবহার প্রায় রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশের' মতই। কোন রকম সামান্য পরিবর্ত্তনও ঘটান মুস্কিল। আমাদের সনাতন ধর্মের দেশে অনাচার চলবে না। মনু-কৌটিল্য যা বলে গেছেন তার উপর আবার কথা থাকতে পারে নাকি? 'চিরদিন' যা চলেছে এ পটভূমিতেই চিরদিন তা চলবে। 'ছোটলোক' চিরদিনই ছোটলোক থাকবে। 'খেটে খাবে' ভদ্রলোকের ছেলে?—ওমা, কি ঘেন্নার কথা। লেখাপড়ায় অমনোযোগী বালকের পক্ষে সবচেয়ে কঠোর ধিক্কারের নমুনা—"লেখাপড়া শিখবে কেন? যাও, চাষ করে খাও গে যাও"। বলুন ত, চাষ করার মত লজ্জাকর কাজ আর কিছু হতে পারে? না সেদিকে বিশেষ ভয়ের কারণ নেই ছোটবেলা থেকেই বাঙালী বালক দেহে

মনে আদর্শ কেরাণী হয়ে গড়ে ওঠে (অবশ্য সকলে যে কেরাণী হবার সৌভাগ্যলাভ করে তা না, কিন্তু সেকথা অবান্তর)

আদর্শ কেরাণীর আর একটি গুণ কি ? নির্বিচার আনুগত্য, ওপরওয়ালা যা বলেন' সেইভাবে কলম পেশা। চিন্তার কোন অবকাশ নেই। চিন্তা করার বদভ্যাস থাকলে কেউ কোনদিন ভাল কেরাণী হতে পারবে না। এই দিকেও আমাদের ব্যবস্থার ত্রুটি নেই। ছোটবেলা থেকেই আমাদের ভালছেলেদের মানসিকতা কেরাণী সুলভ করার ব্যবস্থা আছে। মুখে কথা ফুটতে না ফুটতেই শেখানো হয়,

"সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি
সারাদিন যেন আমি ভাল হয়ে চলি।
আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে"
……"ইত্যাদি।

আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির কথা ভাবুন, দাসসুলভ অন্ধ মনোবৃত্তির পক্ষে এই শিক্ষাপদ্ধতি কত কার্যকরী ভেবে দেখুন। মুখস্থরীতি, নীতিকথামালা, চার দেওয়ালের গণ্ডীর মধ্যে ক্লাস, অর্দ্ধভুক্ত, দরিদ্র বিপর্যস্ত শিক্ষকের শিক্ষাদানে চূড়ান্ত অবহেলা, আত্মনির্ভরতার অমোঘ প্রতিষেধক পরীক্ষা পাশের নোট "Made Easy" ইত্যাদি, এক কথায় আমাদের সমগ্র শিক্ষাপদ্ধতি যে মনের বিকাশকে সুনিশ্চিতভাবে রোধ করে এবং আমাদের ভদ্রলোকের ছেলেদের জীবন সংগ্রামের প্রকাণ্ড অনুপযুক্ত করে তোলো সে কথা দুর্মুখরাও স্বীকার করবেন। প্রয়োজনীয় পরমুখাপেক্ষী দাস মনোবৃত্তি তাই সহজেই গড়ে ওঠে।

কেরাণী জীবনের মূলমন্ত্র "চলো নিয়ম মতে"। গতানুগতিকতার কোন বিচ্যুতি চলবে না। অনেকে বিপ্লবের প্রতীক হিসাবে লাল রঙকেই ধরেন, মত পার্থক্য সত্বেও রক্তপতাকাই সমাজ-বিপ্লবপন্থী অধিকাংশ দলের নিশানের রঙ। তাই বুঝি কেরাণীর এত লালাতঙ্ক। লালাতঙ্ক ছাড়া পাঁচ মিনিট দেরীতে পৌছানর জন্য সামান্য লাল পেন্সিলের একটা দাগের বিভীষিকার আর কোন ব্যাখ্যা চলে না। যে বাঙালীর (ভারতবাসী'র) সময় জ্ঞানের অভাব বিশ্ববিখ্যাত, সেই বাঙালী অফিসের বেলা হলে দুর্ঘটনায় আহত নিজের ভাইকেও হাসপাতালে পৌছে দিতে ইতস্তত করবে, অফিসে 'লেট' হয়ে যাবে যে। আপনারা ত অনেক মনস্তত্ত্বের কথা পড়েছেন, বলুন ত, এই ব্যবহারের আর কি ব্যাখ্যা থাকতে পারে।

অচিন্ত্যেশ ঘোষ

গ্রন্থপরিচয়

বাংলার সাহিত্য : নারায়ণ চৌধুরী : বেঙ্গল পাবলিশার্স। তিন টাকা

একালের বাংলা সাহিত্যকে নিঃসন্দেহে গল্পের যুগ বলা যেতে পারে। গল্পের বিচিত্রমুখী বিকাশে, আঙ্গিক ও কলাবিধির পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এ কালের সাহিত্য বিস্ময়কর অভিনবত্বের সৃষ্টি ক'রেছে। কিন্তু গল্পের বিষয়ানুসারী সম্প্রসারণের সঙ্গে "বিশুদ্ধ প্রবন্ধ" যেন তাল মেলাতে পারছে না—তাই চিন্তাগরিষ্ঠ বা মননশীল প্রবন্ধ অথবা সমালোচনা যেন ক্রমশঃই দুর্লভ হ'য়ে উঠছে। রবীন্দ্রনাথ বহুকাল আগে নিতান্ত আক্ষেপের সঙ্গেই ব'লেছিলেন "গল্প-কবিতা-নাটক নিয়ে বাংলা সাহিত্যের পোনের আনা আয়োজন।" রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটির আজকের দিনেও খুব বেশী রদ-বদল করা যাবে না। খুব মুষ্টিমেয় যে ক'জন প্রবন্ধ-কৈবল্যের সাধক প্রত্যাশাহীন ও সুলভউত্তেজনাহীন জনবিরল পথ ধ'রে চ'লেছেন, নারায়ণ চৌধুরী তাঁদের অন্যতম। তাই "বাংলার সাহিত্য" এই গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ কথিত সেই "সারবান সাহিত্য"কেই সমৃদ্ধ ক'রেছে।

'বাংলার সাহিত্য' গ্রন্থটিতে সতেরটি সাহিত্য-বিষয় বা প্রবন্ধ সঙ্কলিত হ'য়েছে। সাধারণভাবে গ্রন্থটিকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সমালোচনা বলা যেতে পারে। অতি আধুনিক গদ্য সাহিত্য নিয়েও কয়েকটি প্রবন্ধে তিনি আলোচনা ক'রেছেন। লেখকের মনে সবচেয়ে বেশী যে প্রসঙ্গটি উদিত হ'য়েছে—সেটি হ'ল আধুনিক বাংলা গদ্যরীতি সম্পর্কিত আলোচনাগুলি। গ্রন্থটির প্রায় অধিকাংশই বাংলা গদ্যরীতির নানাদিকের আলোচনা। গ্রন্থটির এই শ্রেণীর আলোচনাগুলিই পূর্ণতর। বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে গদ্যরীতির আলোচনা খুব বেশী হয়নি—সেক্ষেত্রে নারায়ণ চৌধুরীর গদ্য ষ্টাইল সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। বাংলা গদ্যের দুর্লক্ষণগুলিকেও তিনি স্পষ্টভাবেই-নির্দেশ ক'রেছেন। প্রমথ চৌধুরী ও তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদের গদ্য সম্পর্কিত মন্তব্যের সঙ্গে নারায়ণ চৌধুরীর বক্তব্যের মিল আছে। শুধু তাই নয় বাংলা গদ্যরীতি প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্যও প্রমথীয় : "ভাবাকুলতা আর কাব্যের কুজ্ঝটিকার দ্বারা জ্ঞানের ভাষাকে মণ্ডিত করার অর্থ তার স্বচ্ছন্দ প্রকাশরোধ করা, তার বক্তব্যের মধ্যে দ্ব্যর্থব্যঞ্জনার সঞ্চার করা। বাংলা গদ্যের এই দ্ব্যর্থ ব্যঞ্জনার দোষ আজও রয়ে গেছে। গদ্য বলিষ্ঠ, ওজোগুনযুক্ত, বক্তব্য বিষয়ে সমৃদ্ধ হ'য়েও যদি তা অস্পষ্টতায় আচ্ছন্ন হয়, এবং একই কালে বক্তব্য বিষয়ের নানারকম অর্থ যদি সম্ভব হয়, তা হ'লে তা কখনও বিজ্ঞান সম্মত গদ্যের রীতিরূপ স্বীকৃত হ'তে পারে না। গদ্য অন্ততঃ প্রবন্ধ সাহিত্যের গদ্য, যুক্তি-শৃঙ্খলার দ্বারা নিয়মিত হওয়া আবশ্যক এবং তা হতে গেলেই তার চিন্তা দ্ব্যর্থবোধমুক্ত এবং শব্দপ্রয়োগ যথাযথ হওয়ার দরকার।" (বাংলা গদ্য,' পৃ৭) প্রমথ চৌধুরী-পাঠকের পক্ষে কথাগুলি

খুব নূতন না হ'লেও, এর পেছনের যুক্তিবত্তা ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আজকের দিনের বাংলাগদ্য লেখকদেরও (বিশেষ ক'রে প্রবন্ধ লেখকদের) এই কথাগুলি প্রণিধান করতে হবে। নারায়ণ চৌধুরী প্রবন্ধের গদ্যরীতিতে পরিচ্ছন্নতা, স্পষ্টতা, ঋজুতা ও যুক্তিনিষ্ঠার পক্ষপাতী। ভাবের কুয়াশা ও শব্দের বর্ণময় ইন্দ্রজাল সৃষ্টি ক'রে অকারণ-ভাবালুতার কাব্য-কুহেলি সৃষ্টি করার তিনি ঘোরতর বিরোধী। এটি তাঁর মাসটার-সুলভ উপদেশ বর্ষণ নয়, তাঁর প্রত্যয়নিষ্ঠ জোরালো বিশ্বাস—কারণ তিনি নিজেও তাঁর গদ্যচর্চার দ্বারা তাই প্রমাণ ক'রেছেন।

'বাংলাগদ্য', 'বাংলাসাহিত্যের ভাষাবিচার', 'মধুভাষা ও চলতি ভাষা', 'বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য', 'প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ' প্রভৃতি রচনা প্রধানতঃ গদ্যরীতিও ভাষা সম্পর্কিত আলোচনা-নির্ভর। চলতি ভাষার স্বপক্ষে অনেক কথা বললেও, এই ভাষার ত্রুটি বিচ্যুতি ও অপূর্ণতার দিকটিও তিনি নির্দেশ ক'রেছেন। চলতি ভাষার বৃহত্তর সম্ভাবনার কথা মনে রেখেও তিনি ব'লেছেন: "চলতি গদ্যরীতির মধ্যে একটা তরল মানসিকতার ভাব আছে, যা কাটিয়ে না ওঠা পর্যন্ত তাঁর যথেষ্ট স্বপ্রতিষ্ঠ হবার সম্ভাবনা অল্প।"—খুবই সঙ্গত কথা। কিন্তু চলতি ভাষার নানারূপ আছে, সবগুলি সম্পর্কে এই মন্তব্য প্রযোজ্য হওয়া উচিত কিনা, এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা থাকলে ভালো হ'ত।

'বাংলার সাহিত্য' গ্রন্থে সবচেয়ে মূল্যবান আলোচনা আছে প্রমথ চৌধুরীর ওপর; 'প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ' ছাড়াও একাধিক রচনায় তিনি বাংলা গদ্যের এই কৃতকর্মা শিল্পী সম্পর্কে আলোচনা ক'রেছেন। লেখকের এই শ্রেণীর আলোচনাগুলি সম্ভবতঃ অন্যান্য প্রসঙ্গের চেয়ে পূর্ণতর আলোচনা। আলোচ্য গ্রন্থের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা "প্রমথচৌধুরীর প্রবন্ধ"। নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধটির মধ্যে প্রমথচৌধুরীর অনন্য-মানসিকতা ও গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্যটি নিপুণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে উদ্‌ঘাটিত হ'য়েছে। স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন ও মননশীল প্রবন্ধটি বাংলাসাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী চর্চার ইতিহাসে একটি মূল্যবান সংযোজন।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে দু'টি প্রবন্ধ আছে: 'রবীন্দ্রনাথের নাট্য সাহিত্য' ও 'মনস্তত্ত্বের মাপকাঠিতে রবীন্দ্র-উপন্যাস'। প্রথম প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্যকে তিনভাগে ভাগ করা হ'য়েছে—নাট্যকাব্য, রূপকাশ্রিত নাট্য এবং বিশুদ্ধ হাস্যরসাত্মক নাটক। রবীন্দ্রনাথের নাটক প্রসঙ্গে এই শ্রেণীর বিভাগ একটু স্থূল ব'লে মনে হয়। বিশেষত, 'রূপক নাটক' অংশটির সংজ্ঞা ও কলাবিধি সম্পর্কেও কিছু সতর্কতার অবকাশ আছে। 'রাজা'কে রূপক নাটক আখ্যা দিলে, 'রক্তকরবী'কে রূপক নাটক বলা সঙ্গত কি না, এ সম্পর্কে কৌতূহলী পাঠকের মনে স্বাভাবিক প্রশ্ন জাগে। তাছাড়া ঋতুনাট্য ও নৃত্যনাট্য সম্পর্কেও কিছু আলোচনা হওয়া উচিত ছিল। শ্রেণীবিভাগ যে রকমই হোক না কেন রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক জীবন-পরিণামের সঙ্গে তাঁর নাটকগুলির সংযোগসূত্র কোথায় অথবা নৃত্যনাট্যই বা কেন তাঁর নাটকের শেষ পরিণতি হ'ল, এ আলোচনা না থাকলে রবীনাথের নাট্যমানসের সামগ্রিক আস্বাদন সম্ভব নয়। 'মনস্তত্ত্বের মাপকাঠিতে রবীন্দ্র-উপন্যাস' প্রবন্ধটিতেও অপূর্ণতার চিহ্ন বিদ্যমান। রবীন্দ্র-উপন্যাসের মনস্তত্ত্বের স্বরূপ ও স্বার্থকতা সর্বপ্রথমে বিচার্য, দ্বিতীয়তঃ ঔপন্যাসিক মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণে দেশ-কাল ও সমাজ ঘটিত পরিবর্তনগুলির সঙ্গে লেখকের

ব্যক্তি-মানসের সম্পর্ক নির্ণয় অত্যাবশ্যক; লাবণ্যের "নারী-হৃদয়ের সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া"র মূল সূত্রটি কোথায় বিশ্লেষণ না করলে বিষয়টি কুয়াসাচ্ছন্নই হয়ে ওঠে। সম্ভবত, লাবণ্যের শেষ চিঠিখানির মধ্যেই তার অন্তর্জীবনের গূঢ়তর সঙ্কেত লুকিয়ে আছে। 'যোগাযোগ' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের সমাজ-সচেতনতার একটি তীব্রতর অভিব্যক্তি আছে। মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের একটি বিশেষ পর্যায় এখানে লক্ষণীয়। প্রবন্ধটির এই অংশে বিষয়টির সাধারণ উল্লেখ মাত্র আছে কিন্তু একটু বিশ্লেষণ থাকলে ভালো হ'ত। বর্তমান যুগে Psychological Novel * নামে বিশেষভাবে চিহ্নিত উপন্যাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের পার্থক্য দেখালে লেখকের বক্তব্য আরও পরিস্ফুট হ'ত মনে হয়।

অতি আধুনিক সাহিত্যের বিভিন্ন পর্যায় সাম্প্রতিক সাহিত্যের কতকগুলি বিশেষ সমস্যা নিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধে আলোচনা করা হ'য়েছে: 'যুদ্ধোত্তর বাংলাসাহিত্য', 'সাহিত্যে যুগান্তর,' বাংলা কথাসাহিত্যের সমস্যা,' 'ভঙ্গি প্রধান সাহিত্য', 'বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য', 'অনুবাদ সাহিত্য', আধুনিক উপন্যাসের স্বরূপ', ইত্যাদি। সমকালীন সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সম্পর্কে আলোচনা করা দুরূহ, বিষয়মুখী যাথার্থ্য রক্ষা করাও সম্ভব নয়। নারায়ণ চৌধুরী তাঁর অক্লান্ত লেখনী সঞ্চালন ক'রে আধুনিক সাহিত্যের ভাষ্যকার হিসেবে খ্যাতিলাভ ক'রেছেন। এই শ্রেণীর প্রবন্ধগুলিতে অনেক বিতর্কমূলক উপাদান আছে, কিন্তু লেখকের মননশীলতা, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ও অনন্য মানসিকতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বিদ্যমান। প্রবন্ধ সাহিত্য ও গদ্যরীতি সম্পর্কিত আলোচনাগুলির মূল্য সবচেয়ে বেশী। প্রবন্ধ সাহিত্য, সমালোচনা সাহিত্য, গদ্যরীতি, রম্যরচনা—প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনার স্বল্পতা লক্ষণীয়। নারায়ণ চৌধুরী সেই স্বল্পালোচিত অংশগুলির ওপর আলোকপাত ক'রে বড় অভাব পূর্ণ ক'রেছেন। আধুনিক উপন্যাস সম্পর্কেও তাঁর প্রশ্ন জেগেছে। সাম্প্রতিক কালে ইউরোপেও উপন্যাসের রূপ, রীতি, কলাবিধি ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নানা বাদানুবাদ চলেছে। লেখক নগরকেন্দ্রিক উপন্যাস' ও 'গ্রামকেন্দ্রিক উপন্যাসাস নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা ক'রেছেন। কিন্তু আধুনিক উপন্যাসের সংজ্ঞা আঙ্গিক ও কলাবিধি সম্পর্কেই প্রশ্ন জেগে ওঠা অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। উপন্যাসের বহিরঙ্গ লক্ষণগুলিই বড় কথা নয়, (উপন্যাস কেন সাহিত্যের কোন বিভাগেরই পক্ষে বহিরঙ্গ লক্ষণ বড় কথা নয়) তার অন্তরঙ্গ স্বরূপ লক্ষণটিই সব চেয়ে বড়। উপন্যাস সম্পর্কিত দুটি প্রবন্ধে এই সম্পর্কে আলোচনা থাকলে পূর্ণভাবে আধুনিক উপন্যাসের সমস্যার উপর আলোকপাত করা সম্ভব হ'ত।

তথাপি এই গ্রন্থ আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারাকে সমৃদ্ধ ক'রেছে সন্দেহ নেই। প্রচ্ছদপট, বাঁধাই ও ছাপা প্রকাশকের পূর্বতন খ্যাতিকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

রথীন্দ্রনাথ রায়

---

* The Psychological Novel (1900—1950) : Lean Edel

সংস্কৃতিপ্রসঙ্গ

চিত্র প্রদর্শনী

কোলকাতার মুজিয়ামে গত ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে ফাইন আর্টসের আকাদেমীর প্রদর্শনী সুরু হয়েছিল। অন্যান্যবার থেকে এবারের প্রদর্শনীতে ছবির সংখ্যা কম আর যার জন্য প্রত্যেকটা ছবিই বেশ আরাম করে দেখা যায়, এছাড়াও ছবির এই সংখ্যালঘুতা আকাদেমীর প্রদর্শনীকে বেশ একটা মান দিয়েছে।

আধুনিক শিল্পকলার বিশেষতঃ abstract, picassoism, two diamentional pattern painting, আংশিক Impressionism, romantic sur-realism, আর non-representational ধারার চিত্রই আকাদেমীর এবছরের সেরা ছবি বলা যেতে পারে। পূর্ণ (সিদ্ধ) (classic) ভারতীয় পদ্ধতিতে আঁকা ছবি নেই বললেই হয়। ভারতীয় চিত্র বিভাগে এত নগন্য সংখ্যার চিত্র সংগ্রহ যে একমাত্র নন্দলাল অঙ্কিত ছবিটি ছাড়া অন্যান্য ছবিগুলির মধ্যে বিশেষ ভাবে কোনটি উল্লেখযোগ্য নয়।

আধুনিক ধারায় আঁকা ছবিগুলোর মধ্যেও কয়েকটি ক্ষেত্রে বিভিন্ন অঙ্কন পদ্ধতির মিশ্রণও বর্তমান, কিন্তু এই মিশ্রণ যে সর্ব্বক্ষেত্রে সার্থক হয়েছে তা বলা যায় না। Picassoর প্রতীকবাদের অঙ্কন পদ্ধতির সঙ্গে ভারতীয় classic subjectএর মিশ্রণ সার্থক নয়। কিংবা Paul klee এর বর্ণবিন্যাসের ভাব বজায় রেখে ভারতীয় রাগ রাগিণীর ছবিও তেমনি অসার্থক। প্রফুল্ল এস, যোশীর আঁকা ১১২ নং ছবিটি এইজন্য ভাল লাগে না। ১১৫নং ছবিটিও ওই কারণে অসার্থক। Two diamentional pattern painting এর মধ্যে আর, ভি, রাওল্ এর আঁকা খান দুয়েক ছবি বেশ ভাল, কিন্তু এঁর ৮২ নং ছবিটার এককোণে অন্য একটি ঘোড়ার সংযোগ ছবিটার সমতা নষ্ট করেছে। কিন্তু এ ছাড়া রং এর ব্যবহার বেশ চমৎকার।

১২২ নং ছবিটি Picassoএর Symbolic অঙ্কন শৈলীর ধারা মেনে করা হয়েছে, কিন্তু কি কারণে শিল্পী বিশেষ করে হাতদুটোর from realistic পদ্ধতিতে বর্ণনা করবার চেষ্টা করেছেন তা বোঝা গেল না। এস, কে, খোসারের আঁকা কয়েকটি ছবি আংশিক প্রতিচ্ছায়াবাদীতার ভাবে আঁকা। এদের মধ্যে ৬৭ নং ছবিটির গঠন পদ্ধতি খুবই চমৎকার, কিন্তু পটভূমির বর্ণলেপন অসার্থক। কালো রং এঁর ছবিতে ব্যবহার হয়নি বলে ছবিগুলো বেশ বর্ণ-উজ্জ্বল হয়েছে।

আরার আঁকার ছবি ১২৪ নং। এর ছবিতে সত্যবাদীতার (varism) সুরটি খুঁজে পাওয়া যায়।

বিমল রায়চৌধুরীর আঁকা ১৪৬, ১৪৮ নং ছবিগুলো কানোয়াল কৃষ্ণানের ১৯৫০ সালের artistry house এর প্রদর্শনীতে তিব্বতীয় নিসর্গ দৃশ্যগুলির কথা মনে করিয়ে দেয়।

Intellectualism এর আওতায় এই প্রদর্শনীর ভাল ছবিগুলিই পড়ে—আর এর মধ্যে আর, ভি, সামোস, এস, এফ, হোসেন, আমিনা আমেদ, রামকুমার কুলকানির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রামকুমারের আঁকা ছবিগুলো একটু বিষাদাচ্ছন্ন রংএর ব্যবহারে একটু গম্ভীর ভাবাপন্ন হয়েছে।

সুধীর খাস্তগীরের আঁকা ১০২ নং ছবিটা সত্যিই ভাল। ছবির উজ্জ্বল হলুদ বর্ণলেপন বসন্ত কালের বর্ণাই মনে করিয়ে দেয়, কিন্তু ছবিটির নামকরণ 'ঋতে' কেন হলো তা ঠিক বোঝা গেল না। এর ১০৮ নং ছবিটার কেন্দ্রবিন্দু ঠিক কোথায় তা বুঝতে পারলাম না।

অধিকাংশ ছবির গঠন প্রণালীতে ত্রুটি থাকার জন্য eye travel line বিষয়বস্তু থেকে সরে গিয়ে ছবির সমতা নষ্ট করেছে। তাছাড়া অক্ষম বর্ণ লেপনের জন্য ছবি একটু অমাজ্জিত হয়েছে। সেই কারণ অনেক ছবির এখানে উল্লেখ করা গেল না। তবুও এবারের আকাডেমীর প্রদর্শনী দেখে মনে হ'ল যে ভারতীয় আধুনিক প্রগতিবাদী শিল্পীরা বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে নিঃসন্দেহে শক্তিশালী হয়ে উঠেছেন।

মাখন দত্তগুপ্তের শকুন্তলার ছবি দুটো একটু বেশী illustrative ধর্মী আর স্বল্প রং এর ব্যবহারে ছবির আসল তত্ত্ববস্তু ব্যাহত রয়েছে।

এদের মধ্যে গোপাল ঘোষের ছবি চারটে বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। তার ২৭৪ নং ছবিটা রং এবং গঠনপদ্ধতির গুণে চমৎকার হয়েছে। কিন্তু ছবি তিনটির একটু একঘেয়েমির জন্য পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করা গেল না।

শৈলজা মুখার্জীর ১৫ নং ছবিটির গঠন পদ্ধতি ও অঙ্কন প্রণালী উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় জীবনের একটি ছবি আধুনিক ধারার বলিষ্ঠ রেখাঙ্কনের গুণে বেশ হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। চিত্রবিভাগের মুখাকৃতিগুলি ভালভাবে উপভোগ করা গেল না, কারণ এদের বর্ণক্ষেপন, আঙ্কিক খুব বেশী উচ্চাঙ্গের হয়নি। একাদেমীর চিত্রবিভাগের মুখাকৃতিগুলি অন্যান্য ছবি অপেক্ষা নিচু মান বিশিষ্ট।

জলরংএ আঁকা ছবিগুলোর মধ্যে কোনটিই উল্লেখ করা যেতে পারে না। এমন কি কাঠ খোদাই, লিনোকাট, লিথোগ্রাফীর বিভাগটিও বেশী উন্নত নয়।

ভাস্কর্য বিভাগটির নিদর্শন বেশ অল্প। খুব বড় কোন কাজ নেই। বলিষ্ট ভাবব্যঞ্জক ভাস্কর্যের অভাব। তবুও রবীন রায়ের 'হাউণ্ড' একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। শক্ত তার ও ধাতুর সংমিশ্রণে বেশ একটু অভিনবত্ব আছে। ফণীভূষণের কাঠের 'মা' দেখে নিগ্রো কাঠ খোদাইর কথা মনে পড়ে। ভাস্কর্য বিভাগে আধুনিক ভাবের কাজ খুবই কম আর এর মানও খুব উন্নত নয়। সারা বছরের প্রদর্শনীতে মাত্র বিশ, বাইশটি নিদর্শন ভারতীয় ভাস্কর্যের, এতে একটু হতাশই হয়েছি। সতীশ চক্রবর্তীর কাজে এখনও চিরাচরিত ভাবই বর্তমান। তবুও বাটনাবাটা রত মেয়েটি মন্দ নয়। অজিত চক্রবর্তী করা মুখ এবং মহাদেব ভট্টাচার্যের 'সংসার' ভালই হয়েছে। এড্ডি সুনারম্ এর করা ২০ নং নিদর্শনটিও রসোত্তীর্ণ হয়েছে।

সবশেষে এটাই বলা যেতে পারে যে প্রদর্শনীর চিত্র বিভাগটি বিশেষ করে আধুনিক চিত্র বিভাগটিই বেশ উন্নত মান সম্পন্ন, কিন্তু ভারতীয় চিত্র বিভাগে crafts বিভাগ এবং ভাস্কর্য বিভাগের মান খুব উন্নত নয়।

নিখিল বিশ্বাস

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩, হইতে প্রকাশিত ও ২ জয়হরি লেনস্থ টেম্পল প্রেস হইতে মুদ্রিত।